কিশোর গ্রন্থাবলী

সরোজকুমার রায়চোধুরী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—আগষ্ট ১৯৫৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

ব্রততী (মুনমুন) কে

—দাদু ভাই



ডাকাতের সর্দার

বছর দুই আগের কথা বলছি :—

শীতকালের সকাল বেলা। আগের রাত্রে টিপি টিপি বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ের রাস্তা কাদা করবার পক্ষে সেইটুকু বৃষ্টিই যথেষ্ট। কতকটা শীতকাল বলে আর কতকটা কাদার জন্যে তখনও রাস্তায় লোক-চলাচল তেমন হয়নি। কেবল কয়েকজন সেকেলে বৃদ্ধের কাদা ভেঙে ছপাৎ ছপাৎ করে পথ-চলার শব্দ আর গুন্ গুন্ স্বরে ভগবানের নামগান মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। কান পর্যন্ত লেপে ঢেকে দক্ষিণের জানালাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে আমি খাটের ওপর শুয়ে আছি। কুয়াসা দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। আজকের ভোরে চমৎকার কুয়াসা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে সব কিছু দেখছি। কেবল একটু নীলচে ভাব। কেমন যেন অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে ঝরে ঝরে পড়ছে। এত সকালে ঘুম আমার বড় একটা ভাঙে না, কেমন ক'রে যেন আজকে ভেঙেছে। বোধহয় কুয়াসা দেখতে ভালোবাসি বলেই এত ভোরে ঘুম ভেঙেছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাই দেখছি। ক্রমে ক্রমে বাইরের কুয়াসা তরল হয়ে এল। আরও একটু পরে আলোর আভাসও জাগল। হাতঘড়িটা খাটের পাশেই তেপায়ার ওপর থাকে। দেখলাম সাতটা বাজতে বেশী দেরী নেই। সূর্য উঠেছে, কিন্তু এই ঘন কুয়াসা ভেদ করে তার আলো পৃথিবীতে এসে ভালো করে পৌছতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই সময় উঠে একবার বাইরে বেড়িয়ে আসি। ইচ্ছে হচ্ছিল,—খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু গরম লেপের তলা থেকে শরীরটাকে টেনে বার করা আমার মতো কুঁড়ে লোকের পক্ষে অসম্ভব।

লেপটা বেশ ভালো করে আর একবার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিলাম। এমন সময় আমার জানালার নীচেই দু'জন লোকে যেন কি বলাবলি করছে শুনলাম। তার' আস্তে আস্তে কথা বলছিল, সব কথা শুনতে পাইনি। কেবল একটা কথা শুনতে পেলাম,—ডাকাত। উৎকর্ণ হলাম। হ্যাঁ, ডাকাতই বটে। ওরা বলাবলি করছে, রণচণ্ডী ডাকাত ধরা পড়েছে সেনেদের বাড়ী ডাকাতি করতে গিয়ে। বলাবলি করছে খুব ভয়ে ভয়ে, আস্তে আস্তে। যেন তাদের কথা অত দূরে সেনেদের বাড়ী রণচণ্ডীর কাছে গিয়ে পৌছলে তাদের আর রক্ষা থাকবে না।

তোমরা রণচণ্ডীর নামও শোনো নি, সে যে কী ভয়ানক লোক তাও জানো না। এমন কি, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক, নাম শুনে এতক্ষণ পর্যন্ত তাই হয়তো ঠাহর করতে পারোনি। রণচণ্ডী পুরুষ। অবশ্য রণচণ্ডীই তার বাপ-মায়ের দেওয়া সত্যিকারের নাম নয়। নাম তার চণ্ডীচরণ কি একটা। কিন্তু দেশের লোকে তার কাণ্ডকারখানা দেখে নাম দিয়েছে রণচণ্ডী। রণ-পায়ে লোকটা অক্লেশে ঘণ্টায় বিশ মাইল পথ চলতে পারে। তার সম্বন্ধে সত্যি-মিথ্যে কত যে সম্ভব-অসম্ভব গল্প এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে তার আর শেষ নেই। সেইসব গল্প শুনে গোটা জেলাটার লোকের এমন হয়েছে যে, ভর্তি দুপুর বেলাতেও যদি শোনে রণচণ্ডী আসছে, তাহলে তখনি কাঁপতে আরম্ভ করবে।

আমিও অবশ্য এতদিন পর্যন্ত তার নামই শুনে আসছি। চোখে দেখিনি। কারণ তার বাড়ী এ গ্রামে নয়।—এই জেলাতেই এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রাধানগর বলে একখানা গ্রাম আছে, সেইখানে। ইতিপূর্বে রণচণ্ডী একবার মাত্র আমাদের গ্রামে পায়ের ধুলো দিয়েছিল,—ওই সেনেদের বাড়ীতেই। সে বছর দশেক আগে। সেবারে অবশ্য সে ধরা পড়েনি, তার অপরাধও প্রমাণিত হয়নি। পুলিস তদন্তে জানা গিয়েছিল, যেরাত্রে সেনেদের বাড়ী ডাকাতি হয় সেই রাত্রে সে ১১৩নং ডাউন প্যাসেঞ্জারে ক্রুদের সঙ্গে কি একটা কারণে দাঙ্গা করার ফলে আজিমগঞ্জ স্টেশনের হাজতে সমস্ত রাত আটক ছিল। তার সঙ্গে বারহারোয়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত একখানা থার্ডক্লাসের টিকিট ছিল। যদি ধরা যায় রাত্রি একটা পর্যন্ত সে সেনেদের বাড়ী

ডাকাতি করেছে তাহলে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, তারপরে চল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে বারহারোয়ায় সাড়ে তিনটের প্যাসেঞ্জার ধরে আবার এইদিকেই সে ফিরছিল। সেযাত্রা ক্রুদের মারপিট করার জন্যে তার পনেরো টাকা জরিমানা হয়েছিল। বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ জজেরা কানেও তোলেন নি। কিন্তু গ্রামের লোকের বদ্ধমূল ধারণা, এ ডাকাতিতে সে না থেকেই পারে না।

ডাকাত এসেছিল কুড়ি জনের বেশী নয়। গোটা গ্রামের লোক তাদের বাধা দিতে ঝুঁকেছিল। গ্রামের মধ্যে মাত্র সেনেদেরই একটা বন্দুক আছে। কিন্তু ডাকাতরা কি কৌশলে তা আগেই হাত করে সেনেদের বাড়ীর প্রত্যেক লোককে বেঁধে ফেলেছিল। এর পরে তাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে গ্রামের লোকের সম্বল রইল লাঠি-সোটা-বর্শা, খোন্তা-কোদাল-কাস্তে আর মুড়ো ঝাঁটা। তাই নিয়েই তারা জড় হয়েছিল। কিন্তু ডাকাতের লাঠির বন্ বন্ শব্দে আর ঘন ঘন হুঙ্কারে কেউ কাছে ভিড়তে পারেনি। সেনেদের বাড়ীর দুটো পশ্চিমে লাঠিয়াল খুন হয়ে গেল, আর সেন-বুড়ীকে ডাকাতরা মশালের ছেঁকা দিয়ে আস্ত রাখেনি। শুধু তাই নয়। ডাকাতি শেষ করে একটার সময় যখন তারা বেরুল, তখন—বোধহয় গ্রামের লোক জড় হয়েছিল সেই রাগে, দু'পাশে যে সব ঘর পড়ল তাইতে মশালের আগুন জেলে পালাল। গ্রামের লোক ডাকাত ধরবে কি, নিজেদের ঘরের আগুন নেবাতেই ব্যস্ত রইল।

সেই জন্যেই গ্রামের লোকের ধারণা, এতে রণচণ্ডী ছিল। নইলে এতবড় নৃশংসতা আর কেউ করতে পারত না। খুন, জখম, ডাকাতি, লোকের বাড়ীতে আগুন দেওয়া যেন তার কাছে একগ্লাস জল খাওয়ার চেয়েও সোজা। এমন ভয়ঙ্কর সে লোক!

সেই লোক ধরা পড়েছে শুনে আমি আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না। ঝেড়ে-মুড়ে উঠলাম। হাত মুখ ধুয়ে এক পেয়ালা চা খাবারও তর সইল না। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। হোক। আমি যেমন ছিলাম সেই অবস্থাতেই কেবল একখানা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে তখনও অল্প অল্প কুয়াসা রয়েছে।

কিন্তু কথাটা আমার কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। রণচণ্ডীকে ধরবে কে? তাকে ধরা মুখের কথা? সে রণ-পায়ে ভর দিয়ে একটা লাফে সকল

লোকের মাথা ডিঙিয়ে চলে যেতে পারে! লাঠি যখন সে ঘুরোয় তখন বন্দুকের গুলি ছুড়লে তার গায়ে বেঁধে না। তার হুঙ্কারে মানুষ ভিরমি যায়। আর সেই রণচণ্ডী ধরা পড়ল! গুজবই হবে। নইলে একশো জন লোকের সাধ্য নেই তার লাঠির মহড়া নেয়।

তবু গেলাম। গিয়ে দেখি, সত্যি। সেনেদের বাড়ীর সামনে যে দুটো নিমগাছ রয়েছে তারই একটাতে রণচণ্ডী পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা। আর হাজার লোক তার চারদিকে জড় হয়েছে।

বলছে তো—রণচণ্ডী। কিন্তু আমার বিশ্বাস হল না। পাৎলা ছিপছিপে, একহারা চেহারা। ঢ্যাঙা। মনে হয় একটা ঠেলা দিলে পড়ে যাবে। তামাটে রং। মুখের গোঁফে, গালপাট্টায়, মাথার চুলে পাক ধরেছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল একটা গামছা দিয়ে বাঁধা। পায়ের ডিমে কেউ বোধহয় বর্শা মেরেছিল। ক্ষতস্থানটা হাঁ হয়ে রয়েছে। আর তা থেকে ধারায় ধারায় যে রক্ত ঝরেছিল তা শুকিয়ে জমে গেছে। গায়ের আরও নানা জায়গায় নানা আঘাতের দাগ। দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে রয়েছে। মাথাতেও বোধহয় কেউ লাঠি চালিয়েছিল। চার আঙুল লম্বা কাটা দাগে রক্ত জমে আছে, আর সেই রক্তে মাথার বড় বড় চুলে স্থানে স্থানে জট পড়েছে। দেখে তাকে মোটেই শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছিল না। রণচণ্ডী এমনি পাতলা ছিপছিপে হতেই পারে না! এ নিশ্চয় অন্য কেউ।

লোকটার হাত দুটো তো পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা আছেই, তার ওপর কোমরেও একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই অবস্থায় একটা পা ছড়িয়ে আর ক্ষত পাটা মুড়ে সে নিঃঝুম হয়ে বসেছিল। চোখ দুটো বন্ধ, বোধহয় ঝিমুচ্ছিল। ঘাড়টা এমনিভাবে হেলে রয়েছে যে মনে হচ্ছে তার ঘাড়ে হাড় নেই। যিসাস্ ক্রাইস্টের এমনি একটা ছবি আছে। অথচ তার সঙ্গে এর কত তফাৎ!

লোকটার চারিদিকে কাতার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। একেবারে কাছে আসতে এখনও ভরসা পাচ্ছে না, কথা কইতেও ভয় পাচ্ছে। রণচণ্ডী (যদি সত্যই লোকটা রণচণ্ডী হয়) সেই যে চোখ বুজে বসে আছে একবার চোখ মেলে চাইছেও না, একটা শব্দও করছে না। যদি কখনও ঘাড়টা ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরছে, অমনি পিছু হঠবার জন্যে ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যাচ্ছে। রণচণ্ডী না পারে কি! যে দড়ি দিয়ে সে বাঁধা আছে সে দড়ি যত শক্ত হোক রণচণ্ডীর কাছে সে তো সুতো।

একটা আড়ামোড়া ভাঙলেই পুট করে ছিঁড়ে যাবে। সে যে ছিঁড়ে পালাচ্ছে না, তাই ভেবেই লোকে অবাক হচ্ছে।

কিন্তু যে কারণেই হোক দড়ি ছিঁড়ে পালাবার কোনো চেষ্টাই সে করছে না। একটা কথাও কইছে না, একবার চোখ মেলে পর্যন্ত চাইছে না। এমন কি সে নিশ্বাস ফেলছে কি না, তাও বোঝা যায় না। এইসব নানা কারণে শুধু আমার নয়, আরও অনেকের সন্দেহ হচ্ছিল, সে সত্যিই রণচণ্ডী কিনা। কিন্তু জনার্দন পাঠক ভিড়ের একেবারে পিছনে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সে শপথ করে বারবার বলছিল যে, লোকটা রণচণ্ডী ছাড়া আর কেউ নয়। তার মামার বাড়ী না কি রাধানগরের পাশের গ্রামে। বহুবার সে রণচণ্ডীকে দেখেছে। ওকে সে ভালো করেই চেনে।

জনার্দন মিছে কথা বলার লোক নয়। বললে, ওই দেখছ বটে পাংলা মতন, কিন্তু লাঠি হাতে করে ও যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কার সাধ্যি ওর চোখের পানে চোখ তুলে চায়। বাঘের মতন চোখ দুটো জ্বলবে, আর সমস্ত শরীর গিঁট গিঁট হয়ে ফুলে উঠবে।

জনার্দন নিজেই এমন চোখ পাকিয়ে কথাগুলো বললে যে, শুনে গা শিউরে উঠল। দারোগা না আসা পর্যন্ত গোটা গ্রামের যত চৌকীদার ছিল সব লাঠি কাঁধে রণচণ্ডীকে পাহারা দিচ্ছিল।

রণচণ্ডী নিশ্চেষ্টভাবে বসেই রইল। সে যে ঘুমুচ্ছিল না তাতে আর ভুল নেই। কি যেন ভাবছিল। বোধহয় আপন দুরদৃষ্টের কথাই। আজ চল্লিশ বছর সে ডাকাতি করে আসছে। সে যে ডাকাত সে কথাও সবাই জানে। তবু ইতিপূর্বে কোনোদিন ধরা পড়েনি। কোনো দারোগা তাকে ধরতে পারেনি। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে কি না ধরা পড়ল! ভগবানের মার আর কাকে বলে! জেলের জন্যে নয়,—জেলের ভয় সে করে না। না হয় বছর কয়েক ঘানিই টানবে, কিম্বা ছোবড়ার দড়িই পাকাবে। কিন্তু লজ্জা কতবড়! গোটা জেলার লোক তাকে যমের মতো ভয় করে। তাদেরই সামনে তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে তো? এর পূর্বে তার মৃত্যু হল না কেন? তার সঙ্গের লোক তাকে ফেলে যাবার আগে কেন তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেল না?

এইসব কথাই বোধহয় সে ভাবছিল। ঘুমোয়নি নিশ্চয়ই। কেননা, ঘুমুলে যে রকম সহজভাবে মানুষের নিঃশ্বাস পড়ে তেমন পড়ছিল না। আর

সত্যি কথা বলতে কি, এমন অবস্থায় কেই বা ঘুমুতে পারে! তার ওপর অত লোক কাতার দিয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে। তারা যদিও চীৎকার গোলমাল করছিল না, কিন্তু একটা চাপা গুঞ্জন তো উঠছিল। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার পক্ষেও তাই যথেষ্ট।

এদিকে নিরর্থক তার চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমরাও ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলাম। দারোগা এলে কি হয় তাই দেখবার জন্যে ছিলাম। ন'টা বেজে গেল তবু দারোগা আসার নাম নেই। এ যেন যাত্রার দলের সেনাপতি, আগে-ভাগে সেজে এসে আসরে বসে আছে, রাজার অভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করতে পারছে না।

হঠাৎ রণচণ্ডী চোখ মেলে চাইলে। জবাফুলের মতো লাল সে চোখ। যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। সামনে যে ছোট ছেলেদের দল ছিল তারা তো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। রণচণ্ডী চোখের ইসারায় কি যেন বলে চোখ বন্ধ করলে।

লোকেরা সে ইসারা বুঝতে না পেরে বোকার মতো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একটু পরে রণচণ্ডী আবার চোখ মেলে চাইলে। ভাঙা ভাঙা বিদ্‌ঘুটে গলায় বিরক্তভাবে বললে, তামাক।

পিছনে কেউ কেউ তামাক খাচ্ছিল। যার ধ্যান কিছুতে ভাঙবে বলে মনে হচ্ছিল না, তামাকের ধোঁয়ায় তার ধ্যান ভাঙালে, মুখও খোলালে!

সমবেত লোকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। চারদিকে কেবল 'তামাক' 'তামাক' রব উঠতে লাগল। যেন কোনো মহাসম্মানিত অতিথি তামাক ইচ্ছা করছেন। এই সুযোগে জনার্দন পাঠক তার হুঁকোটি নিয়ে খুব ভক্তিভরে সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু রণচণ্ডী চোখ মেললে না। ওর চোখ মেলতে যন্ত্রণা হচ্ছিল কি না কে জানে। হয়তো কেউ চোখেই আঘাত দিয়েছে। যে রকম টকটকে লাল চোখ তাতে বিচিত্র কিছুই নয়। যাই হোক, সে আর চোখ মেললে না, না মেলাই ভালো, তাকালে ভয় করে, শুধু মুখটা ছুঁচলো করলে। বেচারীর হাত তো খোলা নেই, কেউ না খাইয়ে দিলে খাবে কি করে? জনার্দন তার নিজের হুঁকোটা ওর মুখের কাছে ধরলে, আর ও নবাব-বাদশার মতো আয়েস করে ধূমপান করতে লাগল।

সেই একটা দেখবার ব্যাপার। যারা অনেকক্ষণ একঘেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তারা আবার ঘুরে এল। সমস্ত লোক

অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল ওর তামাক খাওয়া। ধূমপান পৃথিবীতে এমন একটা দুর্লভ ঘটনা নয়। কিন্তু রণচণ্ডী—যে শুধু হাত দিলেই লোহার সিন্দুকের দরজা খুলে যায়, তেতলায় যে অনায়াসে লাফ দিয়ে ওঠে, রণ-পায়ে ভর দিয়ে যে নদী ডিঙিয়ে যায়,—সেই রণচণ্ডীও সাধারণ মানুষের মতো তামাক খায় এ যেন কেউ ভাবতেও পারেনি। তাই হয়। ওকে সবাই ডাকাত বলেই জানে, মানুষ বলে নয়। সবাইকার ধারণা ও যেন খায় না, ঘুমোয় না, কেবল দিনরাত্রি মাথায় পাগড়ী বেঁধে ডাকাতি করে। যাত্রার দলের রাজার মতো। আমাদের যেমন ধারণা যে রাজা সব সময় ওই একই পোষাক পরে থাকে আর সব সময় অমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বলে, এও ঠিক তাই। রণচণ্ডী যেন কেবল ডাকাত, মানুষ নয়। ভালোই হোক, আর মন্দই হোক, সে সাধারণ মানুষের বাইরে। সুতরাং তাকে সাধারণ মানুষের নিয়মে চলতে দেখে সবাই বিস্মিত হচ্ছিল। বোধ করি সবাই একটু ক্ষুণ্ণই হল। এতবড় একটা বিখ্যাত ডাকাতের কাছ থেকে সবাই একটা অদ্ভুত রকম কিছু দেখবার প্রত্যাশা করছিল। বরং সে একটা কাঁচা হাঁস খেলেই লোকে খুশী হত। তা না করে কি না সামান্য তামাক খাওয়া! আরে ছ্যাঃ!

কিন্তু কী আর করা যায়! ওর ওপর তো কারও কোনো হাত নেই! ও কাঁচা হাঁস না খেয়ে চোখ বুজে আয়েস করে তামাকই খেতে লাগল, আর আমরা সবাই অবাক হয়ে তাই-ই দেখতে লাগলাম।

তবে হ্যাঁ, তামাক খাওয়া বটে!

রণচণ্ডী চোখ বন্ধ করে পনেরো মিনিট ধরে অবিশ্রান্ত তামাক টেনেই চলেছে। টানছে তো টানছেই, তার আর থামাথামি নেই। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। দেখতে দেখতে তার চারিদিকে ধোঁয়ার কুয়াসার সৃষ্টি হল। জনার্দনেরও হুঁকো ধরে থেকে হাত ব্যথা করে গেল। সে হুঁকোটা ডানহাত বাঁহাত করতে লাগল। আমরা ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে সবে ফিরব মনে করছি এমন সময় পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে চমকে চাইতেই নজরে পড়ল জনতার বাইরে দারোগাবাবুর টুপি সমেত মাথাটা।

কনস্টেবলরা হাঁকছে, হঠো, হঠো।

কনস্টেবলদের হাঁকাহাঁকি সত্ত্বেও ভিড় হঠলো না। দারোগাকে বাধ্য হয়ে

কোনোরকমে ভিড় ঠেলে ভিতরে আসতে হল, পিছনে পিছনে একখানা চেয়ারও কোনোরকমে একজন চৌকিদার পৌছে দিয়ে গেল।

তারপরে? সে একটা দৃশ্য!

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। দারোগাকে দেখেই রণচণ্ডী ঘাড় তুলে একবার চেয়েই মুচকি হাসলে! বললে, হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধা দারোগাবাবু। খুলে না দিলে যে চরণের ধুলো নিতে পাই না।

দারোগাও হেসে বললেন, থাক থাক, চরণের ধুলো আর দরকার নেই। তার চেয়ে—

জিভ কেটে রণচণ্ডী বললে, বলেন কি বাবু! আপনারা হলেন ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু। ইহকাল তো গেলই, পরকালের ব্যবস্থাও একটু করব না?

দারোগাও পাল্টা উত্তর করলেন, কিচ্ছু ভেব না কর্তা, তোমার ইহকালই বা মারে কে আর পরকালই বা মারে কে? এই সেনেদের বাড়ীর ডাকাতিতে সেবার কি হয়েছিল মনে নেই?

এবারে রণচণ্ডী মুখ নীচু করে হাসলে। বললে, সেবারে কাজটা ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছিল বাবু। কিছু মনে করবেন না। এবারে তার সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে যাবে। কি বলেন?

দারোগা আব্দার করে বললেন, ইচ্ছা তো আছে। এখন তোমার অনুগ্রহ।

রণচণ্ডী সে কথা শুনে এমন করে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল যে, ভয়ে সমস্ত লোকের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি। সেই সঙ্গে বুকও ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে এই হাসি শুনলে যে মূর্ছা যাবে তার আর বিচিত্র কি!

কিন্তু ভয় যেমনই করুক এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা জমল। ওর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরই ভাঙ্গা ভাঙ্গা। আর রক্তবর্ণ চোখের মধ্যে ভাঁটার মতো বড় বড় তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনে হল, এমন না হলে রণচণ্ডীকে মানায় না।

হাসি থামলে রণচণ্ডী বললে, অনুগ্রহ এবারও হত না বাবু। ক'বেটা আনাড়ির পাল্লায় পড়ে আমার এই দুর্গতি, নইলে কি এখন আমার টিকির দেখা পেতেন?

দারোগার ঠোঁটে ছুরির মতো শানানো হাসি খেলে গেল। নিতান্ত ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, আনাড়ি আবার কোথায় যোগাড় করলে?

কিন্তু রণচণ্ডীর কাছ থেকে চালাকি করে কথা বের করে নেওয়া সহজ কাজ নয়। সে একটু মুচকি হেসে বললে, বরাতে জুটে গেল বাবু। নইলে তিরিশ বছরের পাপের শাস্তি হবে কি করে!

দারোগা তবু হাল ছাড়লেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দলের লোক নাওনি বুঝি? সবই বুঝি এখানকার লোক? এই বুঝি তাদের হাতে-খড়ি হল?

এবারে রণচণ্ডী যেন একটু বিরক্ত হল। বললে, আমার যতদিন ডাকাতি করা হল ততদিনে দু'জন দারোগা পেন্‌সন্ নিয়েছে। আমাকে জেরা করে লাভ হবে না।

অপ্রস্তুত হয়ে দারোগা চুপ করলেন।

একটু থেমে রণচণ্ডী আবার বললে, নাম আমি কারও করব না। তবে এক ঘণ্টার জন্যেও যদি ছাড়া পেতাম, সে বেটাদের কানে ধরে ঘোড়-দৌড় করাতাম। আমাকে ফেলেই যদি গেলি, মাথাটা কেটে নিয়ে যেতে পারলি না?

রাগে রণচণ্ডীর চোখ ঘুরতে লাগল, আর দাঁত কড়মড় করতে লাগল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, সবাই দিব্যি পালাল, আর এক তুমিই বা ধরা পড়লে কি ক'রে?

রণচণ্ডী আকাশের দিকে চেয়ে বললে, মা-কালীর ইচ্ছা। আমার নিজের দলের লোক থাকলে কি এ গাঁয়ের ক'টা ছাগলের ভয়ে ঘাঁটি ফেলে পালাতো? বাবু মশায়, দোষ কারও নয়। ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে। বহু পাপ করেছি, এবার আর আমার নিস্তার নেই।

চণ্ডী ডাকাতের মুখে ধর্মের কথা শোনবার প্রত্যাশা আমরা কেউ করিনি।

দারোগাবাবু বোধ হয় ইতিমধ্যেই কখন ডাক্তারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এসে ওর ক্ষত ধুয়ে ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

দারোগাবাবুর তখনই চণ্ডীকে নিয়ে থানায় ফিরে যাবার কথা। কিন্তু সেনেদের বড়বাবু মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছুতেই ছাড়লেন না। ঠিক হ'ল আহারাদি সেরে তিনটে-চারটের সময় সকলে মিলে থানায় রওনা হবেন।

চণ্ডী কাতরকণ্ঠে স্নান করার প্রার্থনা জানালে। সে প্রার্থনা

দারোগাবাবু মঞ্জুর করলেন। কিন্তু ওর হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল না। সেই অবস্থাতেই একজন চৌকিদার ওকে তেল মাখিয়ে মাথায় বালতি কয়েক জল ঢেলে দিলে। আর একখানা শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিলে।

তখনকার মতো সভা ভঙ্গ হল।

আমাদের আর আহার-নিদ্রা ছিল না। রণচণ্ডীর সঙ্গে আরও কে কে ছিল, কি ক'রে সে আঘাত পেলে এবং কেমন ক'রে ধরা পড়ল, কৌতূহল ছিল এ সম্বন্ধে রণচণ্ডীর নিজের মুখ থেকে সমস্ত কথা শোনবার। তার দলে কে কে লোক ছিল, প্রাণ গেলেও সে কথা সে বলবে না। দলের লোক যা'ই কেন ক'রে থাক না, সর্দার হ'য়ে সে নিজে কিছুতে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

স্নানাহারের পর আমি যখন গেলাম তখন রঙ্গমঞ্চ আমতলা থেকে উঠে সেনেদের বালাখানার বারান্দায় এসেছে। লম্বা-চৌড়া বারান্দা, তার একদিকে গোটা কয়েক চেয়ার খালি প'ড়ে আছে। শুনলাম, দারোগাবাবু সেনেদের বড়বাবুর সঙ্গে ঘটনাস্থল দেখতে গেছেন। রণচণ্ডীরও কিছু উন্নতি হয়েছে। আমতলা থেকে তাকেও উঠিয়ে আনা হয়েছে। দড়ির বাঁধনও আর নেই। হাতে ডবল হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি লাগান হয়েছে। তার ওপর কোমরে দড়ির বাঁধন দেওয়া হয়েছে। সে দড়ির অপর প্রান্ত দারোগার চেয়ারের অদূরে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। আর বারান্দার অপর প্রান্তে ইতিমধ্যেই বহু লোক এসে গেছে। তাদেরই মধ্যে আমিও গিয়ে বসলাম। বারান্দার পূর্বপ্রান্তে যেদিকে রণচণ্ডী ও পুলিশ বসে আছে সে দিকটা নিস্তব্ধ, থমথমে ভাব। আর আমাদের প্রান্তে কে যেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে এমনি গুঞ্জন উঠছে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। সেনেদের বড়বাবুর সঙ্গে দারোগাবাবু ফিরে এলেন। তাঁর মুখ কেমন খুশী-খুশী মনে হচ্ছিল। হবারই কথা। রণচণ্ডীর মতো ডাকাত, যাকে কেউ কোনদিন ধরতে পারিনি, তাকে ধরতে পারা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়।

দারোগা বেশ ভব্যিযুক্ত হয়ে চেয়ারে ব'সে রণচণ্ডীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখ সর্দার, আমি তোমাকে চিনি। তুমি দলের

কারো নাম করবে না সে আমি জানি। আজ ত্রিশ বৎসর ধ'রে তুমি ডাকাতি করে আসছ। আমার মতো কত দারোগা তার মধ্যে এসেছে গেছে, কিন্তু কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। তুমি কি সহজ লোক!

ব'লে দারোগা সকলের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। রণচণ্ডী অনেকক্ষণ থেকেই আপন মনে কি যেম ভাবছিল। কথাটা তার কানে গেল কি না বোঝা গেল না। যেমন ছিল তেমন ভাবেই বসে রইল।

দারোগা আবার বললেন, কারও নাম আমি জানতে চাই না। কি করে ধরা পড়লে সেই কথাটা বলতে তোমার আপত্তি কি? তাতে তো আর কিছু ক্ষতি হবে না।

রণচণ্ডী একটু ভেবে বললে, না। ক্ষতি যা হবার হয়েছে, তার বেশী আর কি ক্ষতি হবে?

দারোগা হেসে বললেন, তাই তো বলছি।

রণচণ্ডী একটু নড়ে চড়ে বসল। আমরাও তার কথা শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে বসলাম।

রণচণ্ডী হঠাৎ বিরক্তভাবে বলে উঠল, সে শুনে আর কি হবে বাবু। পাকে-চক্রে ধরা পড়ে গেছি। এতে কারো কোনো বাহাদুরি নেই। বিশ বার ডাকাতি করতে গেলে একবার ধরা পড়তেই হয়।

দারোগা নরম স্বরে বললেন, তা কি আর জানি না সর্দার? বাহাদুরি নিতে তো চাই না, কিন্তু তোমার মতো ডাকাত ধরা পড়ে সে কেমন পাকচক্র তাই জানতে চাই।

রণচণ্ডী ঝেড়ে উঠে বসল। বললে, শুনবেন সে কথা? আমি তো পশ্চিম দিকে ঘাঁটি আগলাচ্ছি, এমন সময় এক বেটা আনাড়ি এসে বললে, আমরা তো পারছি না সর্দার। বাড়ীর ভেতর এক জাঁহাবাজ মেয়ে আছে সে তো আমাদের কিছুতে কায়দা করতে দিচ্ছে না। মশালের আলোতে দেখলাম, তার মুখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণায় বেটা অস্থির হ'য়ে পড়ছে।

সেনেদের বড়বাবু দারোগার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মা আমার খুব সাহসী। আমার মেয়ে-জামাই না থাকলে কাল আর কিছু রক্ষা করতে পারতাম না। মেয়ে আমার নোড়া দিয়ে এক বেটার মুখে এমন

ক'রে মারলে যে, একটা দাঁত তখনি ভেঙে প'ড়ে গেল। বেটা ভড়্‌কে যে কোথায় পালাল তার পাত্তা পাওয়া গেল না। আর জামাইও একখানা বগি-দা নিয়ে এক বেটার হাতে এমন চোট দিলে যে, বেটার একটা



আঙুল মেঝেয় পড়ে টিকটিকির ন্যাজের মতো লাফাতে লাগল। সেই দাঁত আর আঙুল তো আপনাকে দিলাম।

কথাটা না বলবার জন্যে দারোগা বড়বাবুর গা টিপছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক অত না বুঝে সকলের সামনেই কথাটা ফাঁস ক'রে দিলেন। রণচণ্ডী কথাটা শুনে প্রথমে খানিকটা স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বুঝলে, দাঁত আর আঙুল যখন পাওয়া গেছে তখন অন্ততঃ দলের এই দু'জন লোককে খুঁজে বা'র করা কঠিন হবে না। তারপর,—বেচারারা সবে প্রথম নেমেছে—মারের চোটে হয়তো সব কবুল করে বাকী লোকের নামও বলে দেবে। দারোগাও তার মুখের দিকে চেয়ে বোধ করি মনের কথা টের পেলেন। মনে মনে বোধ হয় একটু হাসলেনও। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বড়বাবু সাদাসিধে লোক, অত জটিলতার মধ্যে নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখন পরের ছেলে-বৌকে সুস্থ ক'রে ভালোয় ভালোয় ফিরে পাঠাতে পারি, তবে না মুখরক্ষা হয়!

দারোগা তাঁর কথায় কানই দিলেন না। রণচণ্ডীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

—তারপর?—রণচণ্ডী যেন স্বপ্ন থেকে উঠল। ম্লান হেসে বললে, বুঝেছি, এবারে আর কারও রক্ষে নেই বাবু! তাহ'লে গোড়া থেকেই বলি শুনুন।

রণচণ্ডী বলতে লাগল:

সেনেদের বাড়ীর পেছনে যে মাঠ, তার পরে যে আমগাছওয়ালা পুকুর, সেইখানে আমরা সব জমায়েৎ হতে আরম্ভ করলাম। ক'জন ছিলাম সে আর বলব না। রাত্রি দশটার মধ্যে সবাই এসে হাজির হলাম। পাড়াগাঁয়ে এগারোটা নিশুতি রাত। মশাল জেলে চুপি চুপি আমরা যখন গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হলাম, একটি প্রাণীও জেগে নেই। বাবুদের সদর দরজায় এসে দেখি ভারি দরজা বন্ধ। দরজা খোলা হবে কি করে? কেউ বলতে পারে না। তখনি বুঝলাম, আনাড়ির পাল্লায় পড়েছি। ডাকাতি করতে এসেছে, অথচ সদর দরজা খোলার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। ভাবলাম, ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

কিন্তু চণ্ডী ডাকাত জীবনে কখনও নিস্ফল হয়ে ফিরে যায়নি। দরজায় সবাই মিলে ক্রমাগত লাথি মারতে লাগলাম। কিন্তু সে যা দরজা, মানুষের পায়ের লাথিতে তার কিছু হবার যো কি! সে শব্দে চারিপাশের লোকজন উঠে পড়েছে। কিন্তু আমরা যখন খেলা আরম্ভ করেছি, কার সাধ্যি দরজা খুলে বাইরে আসে। অবশেষে ভাবলাম পাঁচিল টপকে ভেতরে পড়া ছাড়া উপায় নেই। এই ভেবে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরছি, কোন দিক দিয়ে লাফান সহজ হয়, এমন সময় নজরে পড়ল একটা ঢেঁকি। সেই ঢেঁকি কাঁধে নিয়ে এসে তাই দিয়ে সদর দরজা ভেঙে ওরা তো ঢুকে পড়ল, আর আমরা জনকয়েক পুরানো লোক ঘাঁটি পাহারা দিতে লাগলাম। আধ ঘণ্টাও হয়নি এমন সময় দাঁত-ভাঙা বেটা এসে উপস্থিত। শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। ও বেটাকে ঘাঁটিতে রেখে আমি ভিতরে ছুটলাম।

রণচণ্ডী এই পর্যন্ত বলে আর বাকিটা বলবে কি না ভাববার জন্যে থামলে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তার পরে ?

রণচণ্ডী অনুনয়ের সঙ্গে বললে, তার পরে যা হয়েছে সে তো উনিই সব জানেন ?

বলে বড়বাবুর দিকে চোখের ইসারা করে দেখালে।

বড়বাবু ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠলেন। গর্জন করে বললেন, তাহলে আমার মেয়ের কান থেকে দুল ছিঁড়ে নিয়েছিস তুই ?

বড়বাবুর মেয়ের কান থেকে এমন করে দুল ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে যে কানের নীচের নরম মাংসটা দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে। সকালে ডাক্তার এসে সেলাই করে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু ভালো হতে অনেক দেরী লাগবে। তখন উত্তেজনার মুখে যাই কেন না করে থাকুন, মেয়েমানুষ তো! অতগুলো ডাকাতের চীৎকার, লাঠি খেলা, তাঁর নিজের গায়ের নানাস্থানে মশালের ছেঁকা, সর্বোপরি কান থেকে অমনি করে দুল ছিঁড়ে নেওয়ায় তাঁর স্নায়ুতে যে আঘাত লেগেছে তা সামলে ওঠা তাঁর পক্ষে সহজ হবে না। কানের আঘাতের ফলে তাঁর জ্বর হয়েছে। বেশী নয়, সামান্যই। কিন্তু তাতেই থেকে থেকে চমকে উঠছেন, সভয়ে চারিদিকে চেয়ে কি যেন দেখছেন, আর যদি বা পাঁচজনের শুশ্রূষায় একটু ঘুম আসছে অমনি দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠছেন। তাঁর অবস্থা দেখে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আর দুই গালে মশালের ছেঁকা দিয়ে অমন ফুলের মতো সুন্দর মুখ এমন বীভৎস করে দেওয়া হয়েছে যে, যার গায়ে এতটুকু মানুষের চামড়া আছে সে তা পারে না।

সেই কথা স্মরণ করে বড়বাবু রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি আর একটি কথাও বলতে পারলেন না। কেবল চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তা দেখে রণচণ্ডীও মাথা নীচু করলে, চোখ নামিয়ে নিলে।

রণচণ্ডী একটু থেমে বললে, বাবু মশায়, বাড়ীতে আমারও ছেলে বৌ, মেয়ে জামাই আছে। আপনার চেয়ে তাদের আমি কম ভালোবাসি না। কিন্তু ডাকাতি করতে নেমে দয়া দেখালে চলে না। আপনার মেয়েকে যদি আমি তখন না অমনি করে কাবু করতাম, তাহলে কি আমার দলের একটি লোককেও আটকে রাখতে পারতাম ? সব কে কোন দিকে ভাগতো। ওরা নতুন নেমেছে, মেয়েলোকের গায়ে কিছুতে হাত তুলতে পারত না। পড়ে

পড়ে মার খেতেও পারত না। অবস্থাটা তখন কি হত বিবেচনা করে দেখুন দেখি?

দারোগা মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক, ঠিক। তারপর?

রণচণ্ডী বিরক্তভাবে বললে, তারপর আনাড়িকে ঘাঁটিতে রাখলে যা হয় তাই হল। কোথায় কে একটা বন্দুকের আওয়াজ করেছে, কি হয়তো লোকেরা উঠে হো হো করেছে, অমনি ঘাঁটির পালোয়ান পয়ষট্টি করেছে। দারোগাবাবু, ডাকাতের দলেই হোক, আর লাঠিয়ালের দলেই হোক, একটা লোক ভাগড়া হলে আর কাউকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন না। এই এক মজা বরাবর দেখে আসছি। হলও তাই। একজনকে সরতে দেখে বাকী সব যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে। আমি একা। চারিদিকে বহু লোক তখন সাহস করে এগিয়ে এসেছে। আমার বগলে তখন বহু টাকার মাল। হৈ হৈ করে লাঠি খেলতে খেলতে বাইরে এসে দেখি অন্দরের দরজায় কে ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে দিয়েছে। উপায় নেই, সঙ্গে একটা দোসর নেই, বেশী ভাববারও সময় নেই। লাঠিতে ভর দিয়ে একলাফে পাঁচিলে উঠলাম।

আমরা সভয়ে অন্দরের পাঁচিলের দিকে চাইলাম। সেটা খুব কম হলেও ১০।১২ হাত উঁচু।

রণচণ্ডী বলতে লাগল, কিন্তু বয়স তো হয়েছে বাবু। শক্তি কমেছে। তাল রাখতে পারলাম না। ঘুরে নীচে পড়ে পায়ের গোছে চোট খেলাম। সেইখানেই বহু লোক জুটে হৈ হৈ করছে। ভাবলাম, আর নিস্তার নেই। কিন্তু হঠাৎ আমার পড়ার শব্দ পেয়ে সবাই হুমড়ি খেয়ে কে কার ওপরে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল তার আর ঠিক নেই। চোট খেয়েও আমি কিন্তু তখনি লাফিয়ে উঠলাম। সদর দরজা ভাঙা পড়ে রয়েছে। লাঠিতে ভর করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। ভরসা ছিল, যে বাগানে আমরা প্রথমে এসে জুটেছিলাম সেইখানে সবাই অপেক্ষা করে আছে। কথাও সেই রকম ছিল। সেই মনে করেই ওদিক দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ ধানের গোছে পা লেগে উলটে পড়লাম। সেই সময় ক'জন লোক বোধ হয় ডাকাতদের তাড়া করে গিয়েছিল, ফিরে আসছিল। আমার পড়ার শব্দ পেয়েই তারা টর্চ ফেলল। আর যাই কোথায়! সবাই এসে পড়ল মশায়, আমার ওপর আর লাঠি, টাঙ্গি, বল্লম, যার হাতে যা ছিল বেদম চালাতে লাগল। দলের লোকদের কত ডাকলাম। বললাম, একজন কেউ এসে আমাকে তুলে ধর,

এই ক' বেটাকে এই মাঠে শুইয়ে রেখে যাই। কিন্তু কেউ ফিরে এল না বাবুমশায়। নেহাৎ না পারিস আমার মাথাটা তোরা কেটে নিয়ে যা, চিনতে যেন কেউ না পারে। তবু এল না। এলে কি আর এ দুর্দশা হয়!

রণচণ্ডী হঠাৎ ভীষণ হাঁফাতে আরম্ভ করলে। তার মাথার যেখানটায় ভীষণ চোট লেগেছিল সেখান দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল, ব্যাণ্ডেজটা দেখতে দেখতে রক্তে লাল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল, দু'জন সিপাই তাকে জড়িয়ে চেপে ধরলে তবু কাঁপুনি থামে না। আর ঠোঁটের দুই কষ দিয়ে অশ্রান্ত ধারে লালা স্রাব হতে লাগল। আমরা সবাই চমকে উঠলাম। দারোগাবাবু ব্যস্ত হয়ে তখনি ডাক্তারকে খবর দিতে পাঠালেন। রণচণ্ডী পাঁচ মিনিটের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে সিপাইদের কোলে ঢলে পডল। সেইখানেই তাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দেওয়া হল।

পাখা এল, জল এল, একটু পরে ডাক্তারবাবুও এলেন। সমস্ত দেখে তিনি বললেন, ভয় নেই বেঁচে যাবে। নাড়ী বেশ সবলই আছে। তবে প্রচুর রক্তস্রাব হয়েছে। ক্ষত ধুয়ে দিতেও অনেক দেরী হয়েছে। সেই জন্যেই মূর্ছা গেছে।

আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথায় মানুষ যেমন শোকার্ত হয় দারোগাবাবু তেমনি শোকার্ত হয়ে উঠলেন। রণচণ্ডীর বাঁচার ওপর তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাকে জীবন্ত অবস্থায় জেলে পুরতে পারলে তবে না কৃতিত্ব! সে যদি এইখানে ম'রে যায় তাহ'লে তো সবই শেষ হয়ে গেল। বাকী যে ক'টা চুনোপুঁটি লুকিয়ে আছে তাদের ধরায় বাহাদুরি নেই। দারোগা বারান্দায় ছটফট ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু? আপনাকে আমি ডবল ফি দোব যদি ওকে বাঁচাতে পারেন।

পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। ন্যায্য ফি'টাই সাধারণতঃ মেলে না। তার ওপর একেবারে দ্বিগুণ ফি। খুশী হয়ে বললেন, কিছু ভয় নেই। বাঁচবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে একটা ইন্‌জেকশন করতে হবে। আমি লিখে দিচ্ছি, আপনি একটা কনেস্টেবল পাঠিয়ে দিন সাইকেল করে। পাশের গ্রামেই ওষুধের দোকান আছে, যাবে আর আসবে। ততক্ষণ ওর চোখে-মুখে জল দিন, আর বাতাস করুন।

ডাক্তারবাবু ওষুধের নামটা লিখে দিলেন। সেনেদের বড়বাবু ওষুধের

দাম বাবদ দুটি টাকা বের ক'রে দিলেন। এবং তাঁদেরই বাইসিকেল নিয়ে একজন কনস্টেবল ছুটল মাইল দুই দূরেরে পাশের গ্রাম থেকে ওষুধ নিয়ে আসতে।

ডাক্তারবাবু আর একবার রণচণ্ডীর নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বললেন, এখন ছ'টা বাজে। আপনার কনস্টেবলের ফিরতে সাড়ে সাতটা হবে। আটটার মধ্যে আপনার রোগী ঝেড়ে উঠে বসবে।

হতাশ ভাবে দারোগাবাবু বললেন, আপনার দয়া।

হতাশ হবারই কথা। রোগীর অবস্থা দেখে আমাদের মনে হ'ল আটটার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু ইন্‌জেক্‌শন করারও বোধ হয় সময় পাবেন না।

ততক্ষণ জল দেওয়া আর বাতাস করা চলতে লাগল।

বারান্দা নিস্তব্ধ।

ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা, এরই মধ্যে দারোগাবাবু বিশবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। বারবার প্রশ্ন করেন, সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরতে পারবে তো? ওখানকার দোকানে ওষুধটা পাওয়া যাবে তো? বাঁচবে বলে ভরসা করেন তো?

এই দারোগার মেজাজটি ঠিক দারোগা জনোচিত নয়। এসে পর্যন্ত দেখছি মুখে হাসি লেগেই আছে। কিন্তু দেখতে দেখতে তাও গেল বিগড়ে। বাবুদের বাড়ী থেকে চা খাবার এল। ভদ্রলোক তা স্পর্শও করলেন না। দু'জন চৌকিদার ওদিকে কোণে বসে নিজেদের মধ্যে কি ফিস্‌ফাস করছিল। তিনি খামোকা তাদের গালাগালি দিলেন। যে দু'জন চৌকিদার রণচণ্ডীকে বাতাস করছিল তাদের বুটের গুঁতো দিয়ে আরও জোরে জোরে বাতাস করতে হুকুম দিলেন।

ডাক্তারবাবুকে ধমক দিলেন, আপনি কী রকম ডাক্তার মশাই! চিকিৎসা করছেন অথচ ওষুধ রাখেন না?

ডাক্তারবাবু হাত চুলকে বললেন, ছিল। কি জানেন, কাল সকালে একজনকে ইন্‌জেক্‌শান দিতে ফুরিয়ে গেল।

—কাল সকালে ফুরিয়ে গেছে অথচ এখনও পর্যন্ত আনান নি কেন? মানুষের জীবন নিয়ে ইয়ার্কি!

—আজ্ঞে না। আজকে আনতে দোব-দোব মনে করছিলাম। তা···

মুখ ভেঙচে দারোগাবাবু বললেন, তা, তা, তা কি হল? মনে করছিলেন তো দিলেন না কেন? আমাকে জব্দ করার ফন্দি, না?

থতমত খেয়ে ডাক্তার বললেন, আজ্ঞে না। আমাদের কি জানেন···

—জানি। আপনাদের সব বদমাইসি। এ রোগী যদি ওষুধ আনার আগে মারা যায়, আপনাকে আমি প্রসিকিউট করব। ছ'টি মাস আপনাকে ঘানিঘরে জুড়ব তবে আমার নাম গদাধর সামন্ত।

একটু পরেই বড়বাবুর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললেন, মশাই, একটা আলো দেবেন, না দেবেন না? আমরা এতগুলো লোক অন্ধকারে বসে থাকব?

বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে একটা কি বলতে গেলেন। কিন্তু দারোগা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তেলের দামটা আমিই না হয় দোব মশাই। এমন না হলে আর বাড়ীতে ডাকাত পড়ে!

বলে শ্লেষের সঙ্গে হাসলেন।

একটু আগে দারোগার সামনেই বড়বাবু চাকরকে একটা আলো দিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন। আলো পরিষ্কার করে জ্বেলে আনতে যেটুকু দেরী তার বেশী দেরী হয়নি। কিন্তু দারোগার ধমকে বড়বাবু আবার ব্যস্ত হয়ে চাকরকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

চাকর আলো নিয়ে আসতে বড়বাবু আবার সবিনয়ে দারোগাকে চা খাবারের জন্যে অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু দারোগার মাথার তখন ঠিক নেই। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, চা খেতেই তো আপনার বাড়ীতে আসা! কি কাণ্ড হচ্ছে দেখছেন না, কেবল চা খান, চা খান।

বলে রেগে চায়ের পেয়ালা, খাবারের থালা ছুড়ে উঠানে ফেলে দিলেন। থালা পড়ল ঝন্ ঝন্ করে। চায়ের পেয়ালা উঠানে পড়ে খান্ খান্ হয়ে গেল। বড়বাবু স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

ডাক্তারবাবু আর একবার রণচণ্ডীর বুক ও নাড়ী পরীক্ষা করবার জন্যে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তার যো কি! রোগী তখন কাটা ছাগলের মতো ছট্‌ফট্ করছে আর বারান্দায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। অতগুলো চৌকিদার কনস্টেবলের সাধ্য কি তাকে আটকায়। মাঝে মাঝে তার সমস্ত দেহ ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আবার তখনি ছিটকে গিয়ে পড়ছে। তার হাতের পায়ের

বেড়ীর শব্দ হচ্ছে ঝন্ ঝন্, আর মুখ দিয়ে একরকম অস্বাভাবিক গোঁ গোঁ শব্দ বার হচ্ছে!

দেখে ডাক্তারের মুখ শুকিয়ে গেল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম বুঝছেন?

ক্ষীণকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, বড় ভালো বোধ হচ্ছে না। টিটেনাস···

—তা তো আমি আগেই জানি। আপনার মতো অপদার্থ ডাক্তারের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন ও-রোগী আর বাঁচানো যাবে না! কি বললেন, টিটেনাস?

—তাই তো মনে হচ্ছে। আমি বলছিলাম···

আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আসামী যদি মরে, ওর হাতের পায়ের বেড়ী খুলে আপনার হাতে পায়ে পরাব।

বোধহয় রোগীর সামনে ডাক্তার অন্য মানুষ হয়ে যায়। দারোগার হুমকিতে ডাক্তারবাবু ভয় পেলেন না। বললেন, আমি বলছিলাম, রোগীর হাত-পায়ের বেড়ী খুলে দিলে হয় না?

মুখ ভেঙচে দারোগা বললেন, কেন হবে না? কিন্তু পালিয়ে গেলে দায়ী হবে কে? আপনি?

ডাক্তার আর কথা কইলেন না।

দারোগা বার কয়েক বারান্দায় পায়চারি করে হুকুম দিলেন, দে, ওর বেড়ী খুলে দে। বেচারা মরবেই তো, কেন মিছামিছি বন্ধনদশায় মরে? দে খুলে।

বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের মত বাইরের লোকেরও বুঝতে দেরী হচ্ছিল না যে, চণ্ডীর মৃত্যুর আর দেরী নেই। মাঝে মাঝে তার বুকের ভেতর থেকে একটা ভারী নিঃশ্বাস অদ্ভুত রকমের ঘড় ঘড় শব্দ করে ঠেলে উঠছিল। চণ্ডী মাঝে মাঝে বেশ স্থির হয়ে যেন ঘুমোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ধনুকের মতো বেঁকে এমন গোঁ গোঁ শব্দ করছে যে সে আর চোখে দেখা যায় না।

কনস্টেবল ওর হাতের পায়ের বেড়ী খুলে দিলে। মনে হল যেন, রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করলে। আমরা সবাই প্রার্থনা করছিলাম, বেচারা বেঁচে উঠুক। আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে, বিদেশ-বিভুঁয়ে এমনি ধারা মৃত্যুর চেয়ে শোচনীয় আর কিছুই নেই। আহা, বেচারা বেঁচে উঠুক।

কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখতে পাই না। বেড়ী খুলে দেওয়ার পরে কিছু

সুস্থ বোধ করলেও ওর মৃত্যু যে ঘনিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে ডাক্তার থেকে দর্শক পর্যন্ত কারও মনে কোন সংশয় রইল না।

ভেবে দেখতে গেলে মৃত্যুই তার পক্ষে শ্রেয়। বেঁচে যদি ওঠে জেল অনিবার্য, খুব কম হলেও দশ বৎসর। বয়স ওর এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। জেলে গিয়ে ও যে দশ বৎসর বাঁচবে সে সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। বনের সিংহ খাঁচার মধ্যে ক'দিন বাঁচবে! তবু এ দৃশ্যও যেন কেউ সইতে পারছিল না। এমন কি, সেনেদের বড়বাবু একবার প্রস্তাব করলেন, বাইরে থেকে বড় ডাক্তার আনলে হয় না? ওর অসহ্য যন্ত্রণা বোধহয় তাঁকেও বিচলিত করেছে।

কিন্তু বাইরে থেকে বড় ডাক্তার আনাবার তখন আর সময় নেই। যা হবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়ে যাবে। তাঁর মধ্যে আর বড় ডাক্তার আনা অসম্ভব।

দারোগা ডাক্তারবাবুকে আর একবার ধমক দিলেন, কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দেখছেন কি? রোগীর নাড়ীটা একবার দেখুন না?

এমন সময় সবাই উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল, এসেছে, এসেছে। কনস্টেবলটা বারান্দার এক ধারে বাইসিকেলটা ঠেসিয়ে রেখে ঘাম মুছতে মুছতে ওযুধটা ডাক্তারের হাতে দিলে। এই সময়, চণ্ডী বোধহয় অনেকক্ষণ ছটফট্ করার পর অবসন্নভাবে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। ডাক্তার খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি বার করতে লাগলেন।

একজন চৌকিদার রোগীর পাশে একটা টুল এনে তার ওপর আলোটা রাখলে। ডাক্তার রোগীর বাহুর একটা স্থানে আইওডিন দিয়ে কেবল ছুঁচটা বাগিয়ে ধরেছেন, অমনি হঠাৎ টুলের ওপর থেকে আলোটা মাটিতে পড়ে নিবে গেল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই 'বাপরে বাপরে' বলে হিন্দুস্থানী গলায় শব্দ উঠল। অন্ধকারে কি হল বুঝতে না পেরে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। তখন কতকগুলো মানুষের ঝটপট শব্দ উঠল, এবং পায়ের শব্দে অনুমান করলাম কে যেন ছুটে বাইরে গেল।

কী ব্যাপার!

—দেশলাই! দেশলাই!

আমার পকেটে একটা দেশলাই ছিল। কিন্তু সেটা কোটের পকেটে, না সার্টের পকেটে তাই খুঁজতেই পাঁচ মিনিট কেটে গেল। অবশেষে বাক্সটি পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে কাঠি নেই একটিও।

—দেশলাই! দেশলাই নেই কারও পকেটে? কী জ্বালাতন!

অনেক পরে বড়বাবুর খানসামা ভিতর থেকে একটা দেশলাই নিয়ে এল। আলোটা খুঁজে জ্বালতেই উঠান থেকে আবার হিন্দুস্থানী গলার ক্ষীণ শব্দ উঠল, পাকড়ো, পাকড়ো!

হারিকেনের আলোয় চমকে চেয়ে দেখি, রণচণ্ডীর শুশ্রূষা করছিল যে হিন্দুস্থানী কনস্টেবলটা, সেই। ওখানে গেল কি করে? কপালটা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে! এদিকে থামের আড়ালে একজন চৌকিদার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার দেহের উপরার্ধ বারান্দার ওপরে আর নিম্নার্ধ নীচে ঝুলছে। তার মাথার কাছে ডাক্তারের ইনজেকশান করার ছুঁচটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর ডাক্তারবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, সাড়াও নেই, শব্দও নেই। তাঁর শরীরের খানিকটা দারোগাবাবুর চেয়ারের নীচে। আর···

আর রণচণ্ডী নেই!

এতক্ষণ আমরা সবাই স্তব্ধ হয়েছিলাম। চক্ষের পলকে ভোজবাজির মতো কী যে হয়ে গেল কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না। এখন সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলাম, পাকড়ো, পাকড়ো। ডাকাত পালাল, পালাল।

ছুটতে ছুটতে সবাই বাবুদের বাড়ীর পিছনে যে মাঠ সেইখানে এসে থেমে গেলাম। কোথায় যাব? চারিদিকে এমন অন্ধকার যে নিজের হাত দেখা যায় না। এই অন্ধকারে কোথায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে মরছিল, দেহ ক্ষণে ক্ষণে ধনুকের মতো বেঁকে উঠছিল, মুখ দিয়ে অস্ফুট গোঙানির শব্দ আসছিল, সে যে একটা ঘুঁসিতে অত বড় একটা জোয়ান কনস্টেবলের রগ ফাটিয়ে তাকে অত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে পালাতে পারে তাই বা কে ভাবতে পেরেছিল?

একজন জমাদার সাহস করে প্রস্তাব করলে, দারোগার ঘোড়াটা নিয়ে যদি একবার দেখা যায় হয়তো পাওয়া যেতে পারে। বেশী দূর পালাতে সে পারেনি নিশ্চয়।

দারোগা তাকে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, যাও না ঘোড়াটা নিয়ে। দেবে ঝোপের আড়াল থেকে এক লাঠিতে শুইয়ে। রাত্রে তাকে খোঁজা মিথ্যে। কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

সকলে আবার বাবুদের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। কনস্টেবলটা তখন উঠে

বসেছে, ডাক্তারবাবুও। কনস্টেবলটার কপালে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হল। সে বললে, ডাকাতটা হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে তার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে! কিন্তু হাতুড়ি কোথায় পাবে? এক লোহার বেড়ী। তাও যেখানে রাখা হয়েছিল সেইখানেই আছে। কেউ হাত দেয়নি। হাতুড়ি-টাতুড়ি নয়, রণচণ্ডীর শুধু হাতের ঘুঁসিতেই অমন হয়েছে।

ডাক্তারবাবুর বিশেষ কিছু হয়নি। কেবল উপুড় হয়ে পড়ার জন্যে নাকের খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। সে কিছুই নয়।

এই ঘটনার পরে কিছুকালের জন্যে দারোগা এখানে আস্তানা গাড়লেন। বাবুদের এক ঘর প্রজা ফৌৎ হয়ে গিয়েছে, সেই বাড়ীটা পড়েই ছিলে। সেইখানে সদলবলে তিনি বাস করতে লাগলেন। আহারাদি বাবুদের বাড়ী থেকে পাঠাবার বন্দোবস্ত হল। তাঁদেরও গরজ ছিল। রণচণ্ডী পুলিশের হাত থেকে পালিয়েছে। সেনেদের ওপর রাগ থাকাও বিচিত্র নয়। আর তার মতন লোক কখন যে কি করে বসে তার ঠিক নেই। বোধ হয় সেই জন্যেই বড়বাবু সহজে এবং সানন্দে এই বোঝা বইতে রাজি হয়েছে। রণচণ্ডী ধরা পড়বে এ ভরসা তাঁর ছিল না। ধরা পড়েও যে পালায় তাকে ধরা কি সহজ ব্যাপার! একটা আঙ্গুলের কর্তিত অংশ আর একটা ভাঙা দাঁত, এ নিয়ে হয়তো অনেক ডাকাতকে ধরা সম্ভব হত যদি রণচণ্ডী না পালাত। রণচণ্ডী বাইরে আছে জেনে কে সাহস করে অন্য ডাকাতকে ধরিয়ে দেবে? তাহলে রণচণ্ডী কি আর রক্ষা রাখবে!

কিন্তু দারোগাবাবু হাল ছাড়লেন না। রণচণ্ডী তাঁর কবল থেকে পালিয়ে গেছে এ কলঙ্ক ধুয়ে ফেলতেই হবে। কাটা আঙুল আর ভাঙা দাঁত নিয়েই তিনি তদন্ত আরম্ভ করলেন।

যে বাড়ী পুলিশের আড্ডা সেটা আমার বাড়ীর কাছেই। বাড়ীর পেছনেই একঠা এঁদো ডোবা। তার ওপরেই বাড়ীটা। দিনে রাত্রে মানুষের প্রাণ-ফাটা আর্তনাদে আমার তো আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এই :

স্থানীয় লোকেই যে এই ডাকাতিতে বেশী ছিল এ ধারণা দারোগার মনে বদ্ধমূল। রণচণ্ডীর কথাতেও তাই প্রমাণ হয়। ডাকাতরা প্রথমে এসে যে বাবুদের বাড়ীর পিছনে আমবাগানে জমায়েৎ হয়েছিল তা মিথ্যা নয়। সকালে গিয়ে সেখানে মশাল জ্বালার চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুরকী-ভাঙা

ঢেঁকি দিয়ে সদর দরজা ভাঙার কথাও সত্যি। ঢেঁকিটা তখনও সেইখানেই পড়েছিল। ডাকাতি করার যে বিবরণ সে দিয়েছিল, তাও অন্যান্য লোকের বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। মায় তার অন্দরের পাঁচীল ডিঙিয়ে পালিয়ে আসার বিবরণও যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা একবাক্যে সমর্থন করেছে। সুতরাং এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, তার কথার সবটা সত্যি যদি নাও হয় অনেকটা সত্যি। দ্বিতীয়ত, তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, যে গ্রামে ডাকাতি হয়, সে গ্রামের লোক কেউ না কেউ তার মধ্যে থাকেই। নইলে সন্ধান দেবে কে? রণচণ্ডীর নিজের স্বীকারোক্তিতেও জানা যায়, প্রথমে এসে সদর দরজা খোলার কোন ব্যবস্থা না দেখে সে চটে গিয়েছিল। তার মানে কি এই নয় যে, গ্রামের লোক দলের মধ্যে ছিল, এবং তাদেরই এ ব্যবস্থা করে রাখার কথা? কেবল মুস্কিল হয়েছে এই নিয়ে যে, রণচণ্ডীর কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহ'লে মানতে হয় যে, দলে আনাড়ির সংখ্যা সব না হলেও বেশী ছিল। এখন এই আনাড়িদের বার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যারা এর আগে দু' একবার ডাকাতি করে ধরা পড়েছে, অথবা ধরা না পড়লেও লোকে যাদের সন্দেহ করেছে তাদের নাম জানা আছে। কিন্তু যারা এর আগে আর কখনও ডাকাতি করেনি, এই প্রথম, তাদের নাম পুলিশের খাতায় নেই। সাধারণ লোকেও তাদের সন্দেহ করে না, তাদের খুঁজে বার করা হবে কি ক'রে? ভাঙা দাঁত আর কাটা আঙুল অবশ্য অনেকটা সাহায্য করবে। কিন্তু ঠিক এই দু'জনই যদি বিদেশী লোক হয়। এই সব কথা বিবেচনা করে গদাধর সামন্তর মত দারোগাও কিঞ্চিৎ মুষড়ে আছেন।

তবু হাল তিনি ছাড়লেন না। প্রত্যেক ইউনিয়নে গিয়ে প্রেসিডেণ্টদের সঙ্গে দেখা করে ব'লে এলেন যে, ১০ই জানুয়ারী অর্থাৎ ঘটনার দিন তাঁর ইউনিয়নের যে সমস্ত দাগী অথবা দাগী না হলেও বলবান লোক রাত্রে বাড়ী ছিল না তাদের নাম তাঁর কাছে পাঠাতে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক প্রেসিডেণ্ট ও চৌকিদারকে আরও বলে এলেন যে ইউনিয়নের কোন লোকের যদি সম্মুখের একটা দাঁত ভাঙা, কিম্বা একটা আঙুল কাটা দেখেন তখনই যেন তাকে গ্রেপ্তার করে তাঁর কাছে পাঠানো হয়।

এই নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজের আড্ডায় ফিরে এলেন। তারপর থেকে প্রত্যহ দু'জন-একজন লোক কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় চালান আসতে লাগল, তাদের নিয়ে কি করা হত বাইরের লোক কেউ দেখতে পেত না, কিন্তু

শুনত। বিশেষ আমার বাড়ী সব চেয়ে কাছে বলে আমারই বিপদ হ'ল বেশী। দিনে হয়তো খেতে বসে ভাতের প্রথম গ্রাসটি মুখে দিয়েছি অকস্মাৎ একটা বুকফাটা আর্তনাদ উঠল, বাবারে, মারে, গেলামরে। কতদিন থালা ফেলে উঠে এসেছি, আর খাওয়া হয়নি। রাত্রে হয়তো কেবল একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় উঠল তেমনি শীর্ণ কণ্ঠের আর্তনাদ। সমস্ত রাত্রি আর ঘুম এল না।

একদিন রাত্রে চীৎকার শুনে জানালা খুলতেই দেখি, আমার বাড়ীর পিছনের ডোবার ওধারে অনেকগুলো লোক। তাদের কাছে আলো ছিল। বোঝা গেল তারা পুলিশের লোক। বিস্মিত হ'য়ে ভাবলাম, এই শীতের নিশুতি রাত্রে ওরা ডোবার ধারে করছে কি? ডাকাতে কি ডোবার জলে মাল-পত্র ফেলেছে? তারই কি সন্ধান পাওয়া গেছে? কিন্তু তারা এদিকে গ্রামের ভেতর দিকে আসবে কি করতে?

সম্প্রতি দারোগার ব্যবহারে তাঁর ওপর আমার আস্থা নেই। রণচণ্ডী পালাবার পর থেকে তাঁর মেজাজ এমন হয়ে উঠেছে যে, তাঁর কাছে ভদ্রলোকের মান-সম্মান বজায় রাখা কঠিন। কাকে কখন কোন কথা বলে বসেন কিছুই স্থিরতা নেই। চৌকিদারদের তো সব কাজ পণ্ড, আর গালাগালি আর প্রহার খেতে খেতে প্রাণান্ত। পাড়া-গাঁয়ের চৌকিদার, বেচারার চৌকিদারীই একমাত্র পেশা নয়। কারও জমির ধানকাটা বাকি, মাঠের ধান রইল মাঠেই পড়ে। হয়তো গাঁটের পয়সা খরচ করেই কাটিয়ে নিতে হবে। কারও গরু-বাছুর একমুঠো খড়ের অভাবে মরে। চৌকিদারদের মধ্যে যারা নিজেরা জমি ভাগে করে না তারাও এই সময় মজুর খেটে বেশ দু'পয়সা করে। এবারে বন্ধ হয়েছে। একে এই সব নানা কারণে মন তাদের ভালো নেই, তার ওপর কথায় কথায় দাঁতুনি। বেচারারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে দিবারাত্রি দারোগার সামনে হাজির থাকা, আর কথায় কথায় এখানে ওখানে ছোটা কি শান্ত নির্বিরোধী বাঙালী চৌকিদারের পোষায়?

চব্বিশ ঘণ্টা এই দেখে দেখে দারোগার ওপর আমি কেমন বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলাম। এখন মনে হল, না, লোকটা কৰ্ম্মিৎকর্মা বটে! মনে হল দারোগার মেজাজ কড়া না হলেও চলে না। চীৎকার, হৈ-চৈ যতই হোক, অবশেষে মাল বেরুল তো! জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলাম, কি। কি জিনিস পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েও শীতে আমার হাড়ের

ভেতরে পর্যন্ত কন কন করছিল। তবু কৌতূহল দমন করতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই দারোগার কঠোর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম,—

—বল্, কে কে ছিল বল্।

এ এবার কি!

হঠাৎ ডোবার জলে বোধ হয় একজন কনস্টেবলই টর্চের আলো ফেললে। দেখতে পেলাম ডোবার মাঝজলে হাঁড়ির মতো কি একটা ভাসছে। কালো হাঁড়ি। কিন্তু দুলছে না তো!

আবার দারোগার গলা শোনা গেল,—

—বলবি না? থাক বেটা সমস্ত রাত জলে গলা ডুবিয়ে।

ডোবার মধ্য থেকে অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে কি উত্তর এল শোনা গেল না। কিন্তু ভয়ে আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত শিউরে উঠল। এই দুরন্ত শীত। আর ওই ডোবার বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা জল। ওর পুব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিক বাঁশের ঝাড়ে এমন করে ঘেরা যে, সমস্ত দিনের মধ্যে জলে একটি ফোঁটা রোদ পড়ার উপায় নেই! সেই জলে কাকে ডুবিয়ে রেখেছে কে জানে! লোকটা দোষী হলে অবশ্য কথা নেই। কিন্তু যদি দোষী না হয়?

হঠাৎ ডোবার ধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। এত দূর থেকে মাত্র একটা লণ্ঠনের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মনে হল ওপরের লোকগুলো জালটানার মতো করে কি যেন টেনে তুলতে লাগল। তাই বটে। কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে থাকার ফলে লোকটার সর্বাঙ্গ যে অসাড় হয়ে যাবে এবং সে যে ডুবে যাবে পুলিশ সে কথা জানে। তাই আগে থাকতেই ওর কোমরে একটা দড়ি বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়েছিল। বোধ হয় লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। সবাই মিলে তাকে ডাঙ্গায় টেনে তুললে। জল বিশেষ খায়নি। ওর গা মাথা মুছিয়ে, আগুন জেলে সর্বাঙ্গে সেক দিতে লাগল। একটু পরেই লোকটার চৈতন্য ফিরে এল। তখন সকলে মিলে ধরাধরি করে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল।

তারপরে কি হ'ল ভগবান জানেন।

পুলিশের যেখানে আড্ডা সেখানে বাইরের কোনো লোকের প্রবেশের অধিকার ছিল না। সুতরাং দারোগা যে কি পথ ধ'রে তদন্ত করছেন

বাইরের লোকের তা বোঝবার উপায় নেই। আমরা শুধু এইটুকু বুঝতে পারতাম যে, চারিদিকের যত পুরোণো দাগী দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে সব একে একে ধ'রে আনা হচ্ছিল। তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার কিছু কিছু আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এ সম্বন্ধে কোনো কথা চৌকিদারদের জিজ্ঞাসা করলে তারা সভয়ে ঠোঁট কোঁচকাতো। কোনো উত্তরও করত না, সেখানে আর দাঁড়াতও না। তবে তাদের মুখ চোখ দেখে বুঝতে দেরী হত না যে, ঘটনার সূত্র আবিষ্কার করার জন্যে ধৃত ব্যক্তিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হ'ত যে, ডাক্তার ডাকতে হ'ত। ভদ্রলোক ফি পেতেন কি না জানি না। কিন্তু কার কি চিকিৎসা করে এলেন বাইরে এসে বহু সাধ্য সাধনাতেও তার একটি কথাও প্রকাশ করতেন না। কেবল দেখা গেল কয়েকজনকে দেখে আসার পর থেকে তাঁর চোখের চাউনি কেমন বদলে গেছে। সব সময় চকমক ক'রে চান, কোথাও একটা শব্দ শুনলেই চমকে ওঠেন, সন্ধ্যার পরে মুখুয্যেদের বৈঠকখানায় পাশার আড্ডা বসে। ডাক্তারবাবুর পাশার নেশা ভয়ানক। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় আসতেন আর বাড়ীর লোকের বহু ডাকাডাকি সত্ত্বেও একটার আগে উঠতেন না। কিছুদিন থেকে ভদ্রলোক সে সব বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলেও বলেন না।

সে যাই হোক, মাস খানেক ধ'রে বহু দাগী ধ'রে আনা হ'ল, তাদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচারও হ'ল কিন্তু তাতে ক'রে ডাকাতির কোনো কিনারা হচ্ছে এমন আশা পাওয়া গেল না। যে দুটি মহামূল্যবান বস্তুর ওপর নির্ভর ক'রে পুলিশ এখানে রয়েছে সে দুটো কোনো কাজেই আসছে না। দাঁত এবং আঙুলের মালিকের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। তা থেকে পুলিশের ধারণা হ'ল, এই লোক দুটো এখানকার নয়। এটা সহর নয়, পাড়া গ্রাম। প্রত্যেকে পাশের বাড়ীর খবর রাখে। আঙুলের দুটো পর্ব কারও না থাকলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো লোকের নজরে পড়ত। দিন রাত্রি মুখ বুজেও মানুষ থাকতে পারে না। হাঁ করলেই নজরে পড়ত, এই লোকটার দাঁত নেই। আঙুল আর দাঁত এ তো আর লুকানো চলে না। এখানকার কারও হ'লে এর মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। ডাকাতির কিনারা করা সম্বন্ধে পুলিশ ক্রমেই হতাশ হচ্ছিল।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল :

গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে বইছে বাবলা নদী। নদীটি পশ্চিম দিক থেকে পূর্বমুখে আসতে আসতে গ্রামের প্রান্তে এসে হঠাৎ উত্তরবাহিনী হয়েছে। সেইখানে একটা বড় বটগাছের নীচে ভাড়িখানা। কতকটা বটগাছের ছায়ায়, কতকটা করবী, রাংচিতা, বনফুল, আশশ্যাওড়া গাছের জঙ্গলে স্থানটা এমন হয়ে আছে যে, দিনের বেলাতেও সেখানে যেতে ভয় করে। বিশেষ তার পরেই শ্মশান।

একদিন হঠাৎ দেখা গেল নদীর জলে একটা মড়া। তার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অর্ধেকটা জলে, আর পায়ের দিকটা ডাঙ্গায় উঁচু হয়ে রয়েছে। ঠিক সেইদিনই দারোগাবাবু একজন জমাদারকে ক্যাম্পে রেখে থানায় গিয়েছিলেন। এখানে প'ড়ে থাকলে তো তাঁর চলবে না। থানায় আরও অনেক কাজ আছে। জমাদার এসে দেখলে, লাসের যে অংশ জলে সে অংশের অনেক জায়গা মাছে, কাছিমে এবং আরও অনেক জলজন্তুতে ঠুকরে খেয়েছে। চোখ তো নেইই। পায়ের দিকেও অনেক জায়গা শেয়াল কুকুরে খেয়েছে।

লাসটা পচে ফুলে এমন বিকৃত হয়েছে যে, চেনাও দুষ্কর। দুর্গন্ধে কাছে যায় কার সাধ্যি! হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমাদার তো কাছেই এল না। অনেক দূরে থেকে চীৎকার ক'রে ক'রে কি করা হবে, না করা হবে সে সম্বন্ধে হুকুম জারি করতে লাগল।

চারিদিক থেকে বহুলোক এল লাস সনাক্ত করতে। কেউ নিশ্চয় ক'রে সনাক্ত করতে পারলে না। চিনতে পারার কথাও নয়। জীবিত কালের চেহারার সঙ্গে লাসের আর কোন মিল নেই।

ভালো ক'রে লাস পরীক্ষা করে এইটুকু জানা গেল, তাকে কেউ খুন করেছে। তার পিঠে কে একটা বড় ছোরা আমূল বসিয়েছিল। স্থানটা এখনও হাঁ হয়ে আছে। আর তার ভেতর দিয়ে ছোট ছোট বোয়াল থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় গলদা চিংড়ি একেবারে পাকস্থলীর ভিতরে পর্যন্ত গিয়ে প্রবেশ করেছে। খুন যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খুন ক'রে কেউ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল, ভাসতে ভাসতে এসে বাঁকের মুখে আটকে গেছে; নদীতে ভাসতে ভাসতে এসে থাকে তা'হলে হয়তো বহুদূরের লাস। এখানকার লোকে চিনতে পারবে না।

সর্বাঙ্গ ঢেকে এমন করে শুয়েছিল যে, ভোর হওয়ার খবরই পায়নি। ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখে জমাদার পাগলের মতো মাথা চুলকোচ্ছে, আর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে,—দারোগার চোখ লাল,—আর, লাস নেই!

চৌকিদার দু'জন কাঁদতে কাঁদতে বললে, তারা রাত দুটো পর্যন্ত জেগে পাহারা দিয়েছে। তারপর সিপাহীদের উঠিয়ে দিয়ে তবে শুয়েছে। তখনও পর্যন্ত লাস ছিল, সিপাহীজি নিজেও তা দেখেছেন।

ভ্যাগ্যিস চৌকিদার দু'জনের পাহারার সময় লাস যায়নি তাই রক্ষা। নইলে বেচারাদের চাকরী তো যেতই, আরও যে কি হত ভগবান জানেন।

তাদের জবানবন্দীর পর কনস্টেবলের পালা। বেচারা লাস দেখেনি বলতে পারলেই খুশী হত, কিন্তু তার কোনোই উপায় ছিল না। চৌকিদারের সামনে সে নিজে লাসের ওপর টর্চ ফেলেছে, তাছাড়া একটা শেয়াল ঝোপের আড়াল থেকে চুপি চুপি আসছিল। তার ওপর টর্চ ফেলতেই বেচারা কতকটা ভড়কে গিয়ে নদীর জলেই লাফিয়ে পড়ে। বহু কষ্টে বেচারা স্রোতের মুখে নিজের প্রাণ রক্ষা করে। এত কাণ্ডের পরে আর লাসের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সুতরাং বেচারার মাথা চুলকানো ছাড়া আর উপায় কিছু রইল না। সে চীৎকার করে বলতে লাগল: এ জরুর সেই বেটা শেয়ালের কাজ এবং সেই বেটা শেয়ালের উদ্দেশে নিজের অজান্তেই একবার লাঠিটা ঘুরিয়ে নিলে।

যদি শেয়ালেই নিয়ে গিয়ে থাকে,—আর তা অসম্ভবও নয়,—তাহলে কাছেই কোথাও থাকবে নিশ্চয়। দারোগা সামনের জঙ্গলে, পাশের শ্মশানে এবং নদীর ধারেও লাস খোঁজবার জন্যে চৌকিদার পাঠালেন। কিন্তু তাঁর মন ডাকছিল, এ কিছুতে শেয়ালের কাজ নয়। তিনি কনস্টেবলকে বারে বারে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, কোনো লোককে সন্দেহজনক অবস্থায় আশে পাশে ঘুরতে দেখেছে কিনা।

ভীত কনস্টেবল তাড়াতাড়িতে নিজের পাগড়ি ছুঁয়ে শপথ করলে, কাউকে দেখেনি।

পাশের জঙ্গলটা দেখিয়ে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানেও তো কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে?

সিপাহীটা নানা দেবদেবীর শপথ করে বলতে লাগল, তেমন ঘুম সে ঘুমোয়নি। তার সামনে দিয়ে কেউ লাস চুরি করতে এলে সে নিশ্চয় টের

পেত। আর এত বড় কলিজাই বা কার আছে, যে সরকারের সিপায়ের সামনে থেকে লাস চুরি করতে আসবে!

একথা দারোগার মনে লাগলো। তিনি নিজে এসেও দেখেছেন সিপাহী ছুই-এ ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। যত নিদ্রাই সে যাক, একটা মানুষকে অমনভাবে ঘুমুতে দেখলে কেউ লাস নিয়ে যেতে সাহস করবে না। আর সেও সহজ লাস নয়, একটা রীতিমত জোয়ান লোকের লাস। অন্ততঃ চারজন লোক লাগবে তাকে সরাতে! চারজন লোক এসে এতগুলো লোকের সামনে দিয়ে নির্বিঘ্নে লাস নিয়ে সরে পড়বে এও বিশ্বাস করবার কথা নয়।

তবে কি ভেসেই গেছে?

তাই বা কি করে সম্ভব? লাসের অর্ধেক ডাঙ্গায়, অর্ধেক জলে। তার ওপর ঢেউএর মুখ আটকে আছে একখানা নৌকো। লাসে খুব জোরে ঢেউ লাগার উপায় নেই।

চিন্তিতভাবে দারোগা জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, লাস কেউ সনাক্ত করতে পারেনি?

—না। কেবল বাঁ হাতের মাদুলি থেকে অনেকে অনুমান করছে পঞ্চী কামার বলে একটা লোকের।

—তার বাড়ী কোথায়?

—এই গাঁয়েই। লেকেন তার লাস নয়।

—কেন?

জমাদার হেসে বললে, মাদুলি ঠিক আছে। লেকেন দাঁতে গোলমাল বাধছে।

দারোগা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, পঞ্চীর বাড়ী কোথায়?

গ্রামের একজন লোক এগিয়ে এসে বললে, পৈতৃক বাড়ী তার এইখানেই। কিন্তু এখানে তার জমি-জায়গা কিছু তো নেই তার ওপর মা বাপও মরে গেল। বেচারা মনের দুঃখে মামার বাড়ীতে গিয়ে বাস করছে। মাঝে মাঝে এখানে আসে, দু' একদিন থাকে, আবার চলে যায়।

—এর মধ্যে কবে এসেছিল বলতে পার?

—দিন কয়েক আগে যেন দেখেছিলাম।

—তারপরে?

—তার দেখছি না। বোধহয় মামার বাড়ী মদনপুরই গেছে।

—মসিনপুর-মদনপুর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চেনেন ?

দারোগা সে কথার উত্তর না দিয়ে ঘোড়া আনতে হুকুম দিলেন।

জমাদার শশব্যস্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বাবু, আপনার চা ?

ঘোড়ার ওপর উঠে চলতে চলতে দারোগা বলে গেলেন, ফিরে এসে।

জমাদারের বুদ্ধি কম হলেও এটুকু বুঝতে পারল যে দারোগাবাবু তার সঙ্গে রসিকতা করে গেলেন। নইলে দশ ক্রোশ পথ এসে আর চা-পানের বেলা থাকে না।

যে কনস্টেবলের গাফিলতিতে লাস চুরি গেছে সেও জোড় হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

দারোগা কুটিল দৃষ্টিতে বলে গেলেন, তোমাকে বকশিস দেবার জন্যে ফিরে এসে সরকারের কাছে রিপোর্ট করব।

কনস্টেবল ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মদনপুরে যাওয়া একেবারে বৃথা হল না।

পঞ্চী কামারের মামা বললে, পঞ্চী এইখানেই থাকে বটে, কিন্তু ক'দিন হল তার নিজের বাড়ী রূপসা গেছে। এখনও ফেরেনি।

দারোগা গম্ভীরভাবে বললেন, আর ফিরবে না।

পঞ্চীর মামা নিতান্ত নিরীহ লোক এবং নিরক্ষর। দারোগার কথার গূঢ়ার্থ কিছু বুঝে আর কিছু না বুঝে হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দারোগা তার মুখের ভাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে ধীরে ধীরে বললেন, পঞ্চী মারা গেছে।

পঞ্চীর মামা-মামীর ছেলেপুলে ছিল না। পঞ্চীকেই তারা ছেলের মতো স্নেহে ও যত্নে মানুষ করছিল। দারোগার কথা শুনে বুড়ো চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে শুধু একটা কাতর শব্দ বার হল, ওঃ!

ওদিকে ভিতরে বোধ হয় পঞ্চীর মামী আড়লে দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল। বেচারী কথাটা শুনেই প্রথমে দরজায় ধাক্কা খেলে, তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। পঞ্চীর মামাও তখন থর থর ক'রে কাঁপছিল। তাকে দেখেই দারোগা বুঝলেন, লোকটা নিতান্ত নিরীহ। তাঁর দয়াও হ'ল। কোমল স্বরে বললেন, লাস যে ঠিক পঞ্চীরই

তা এখনও সনাক্ত হয়নি। তার মুখ দেখে চেনবার উপায় নেই। তবে তার বাঁ হাতের মাদুলি দেখে রূপসার লোকে অনুমান করছে, লাস পঞ্চী ছাড়া আর কারও নয়।

মামা তাড়াতাড়ি বললে, হ্যাঁ, তার বাঁ হাতে মাদুলি ছিল বটে। দু'দিকে দুটো রুদ্রাক্ষ, আর মধ্যে একটা সোনার মাদুলি।

দারোগা দেখলেন, লাসের বর্ণনার সঙ্গে মিলছে। বললেন, কিন্তু একটা গোল বেধেছে। লাসের সামনের একটা দাঁত ভাঙা। পঞ্চীর নাকি···

—ছিল, ছিল। সামনের একটা দাঁত কিছুদিন আগে ভেঙেছিল। ওগো, ও আমাদেরই পঞ্চী।

ব'লে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

তার কান্না একটু থাকলে দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ক'রে দাঁত ভাঙল?

চোখ মুছে মামা বললে, মাসখানেক হ'ল সে রাধানগরে সাহেবের কুঠিতে চাকরী করব ব'লে বাড়ী থেকে যায়। কি ক্ষণে যে বেরিয়েছিল বাবুমশায়, চাকরী তো হ'লই না, ফেরবার সময় অন্ধকারে একটা পাথরের ওপর এমন ক'রে পড়ল যে, সামনের একটা দাঁত গেল ভেঙে। ক'দিন তাই নিয়ে কি কষ্ট বাবু! মুখ ফুলে হাঁড়ির মতো হয়েছিল। কত ক'রে তবে আরাম হয়।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ক'দিন আগে যখন রূপসা যায়, তখন তো সেখানকার লোক দাঁত ভাঙা দেখেনি?

—দেখবে আর কি ক'রে বাবু? গরীবের ছেলে হলে কি হয়, ছেলের আমার বাবুগিরি ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। ক'দিন পরে দাঁত বাঁধিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

—হুঁ।

ভিতরে তখন নারীকণ্ঠের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছিল। পঞ্চীর মামাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দারোগা চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলেন।

—এমন সর্বনাশ কে করলে দারোগাবাবু? সে যে আমার কখনও কারও কাঁচা আলে পা দেয়নি!

সে কথা দারোগাবাবু জানলে আর কষ্ট করে এতদূর আসবেন কেন?

তিনি আপন মনেই ভাবছিলেন, পঞ্চীর যে বিবরণ তার মামা দিলে, তার কতখানি সত্যি? প্রথমতঃ লাস যে পঞ্চীরই এ বিষয়ে এখনও নিশ্চয় ক'রে কিছুই বলা যায় না। যদি লাস চুরি না যেতো এবং মামাকে দিয়ে সনাক্ত করানো যেতো, তাহ'লে অনেকটা নিঃসংশয় হওয়া যেতো। তার উপায় নেই। এখন যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, লাস পঞ্চীরই, তাহ'লেও যেহেতু তার একটি দাঁত ভাঙা সেই হেতু তাকে সেনেদের বাড়ীর ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বাস্তবিকই অন্ধকার রাস্তায় আসতে আসতে একটা পাথরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে দাঁত ভাঙা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাকে সন্দেহ করার একমাত্র কারণ এই যে, সেনেদের বাড়ীর ডাকাতি এবং তার দাঁত ভাঙা, দুটো ঘটনা প্রায় এক সময়েই ঘটেছে। কিন্তু সংসারে এমন অনেক ঘটনাই একসঙ্গে ঘটে। যদি এই বাংলা দেশেরই সেই মুহূর্তের হিসাব নেওয়া যায়, তাহ'লে হয়তো দেখা যাবে যে, ওই রাত্রে দু' হাজার পাঁচশো পনেরো জনের দাঁত কোনো না কোনো দুর্বিপাকে ভেঙেছে। তাই ব'লে যেহেতু তাদের ওই রাত্রে দাঁত ভেঙেছে, সেই হেতু তাদের সেনেদের বাড়ীর ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হোক, এমন তো আর হ'তে পারে না।

কিন্তু এত সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক অনুসরণ করলে আর দারোগাদের চোর ধরা হয় না। সাধারণ আইন এই যে, যতক্ষণ কোনো লোকের দোষের উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে নির্দোষ বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু পুলিশের নিয়ম আলাদা। তারা যতক্ষণ না একজন লোক নির্দোষ বলে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে দোষী বলেই ধরে নেয়।

সুতরাং লাস যারই হোক, নানা ঘটনাচক্রে পঞ্চীর নাম পুলিশের নোট বইতে একবার যখন স্থান পেয়েছে, সহজে তার নিস্তার নেই। দারোগাবাবু তার সম্বন্ধে এইভাবে অগ্রসর হলেন:

জীবিত পঞ্চীকে না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হল লাস তারই, এবং যেহেতু তার সম্মুখের একটা দাঁত ভাঙা, সেহেতু অন্য বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, ধরে নেওয়া হল, সে সেনেদের বাড়ীর ডাকাতিতে ছিল। কিন্তু তাকে খুনই বা কে করবে? এবং কেন? মামা বলছে, সে অত্যন্ত নিরীহ এবং নির্বিরোধ লোক ছিল। নিরীহ কথাটা মিথ্যা, নিরীহ লোক ডাকাতি করতে যায় না। তবে নির্বিরোধ হতে পারে। গ্রামের কারও সঙ্গে হয়তো

তার শক্রতা ছিল না। তবে সে খুন হবে কেন? শুধু শত্রুতা নয়, গুরুতর শত্রুতা না থাকলে মানুষ মানুষকে খুন করে না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি এজন্তে কাকেও সন্দেহ হয় না?

ঘাড় নেড়ে কামার বললে, কাকেও না বাবু, এ গাঁয়ে তার শত্রু নেই। তার কাছ থেকে উপকার না পেয়েছে, এ গ্রামে এমন লোক নেই। মানুষ বিপদে পড়েছে শুনলে সে বুক দিয়ে গিয়ে পড়ত।

এ উত্তরে দারোগা চিন্তিত হলেন। পন্ধীর যে বিবরণ তিনি পেলেন, তা ডাকাতের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সামনের দাঁত যখন তার নেই, তখন সহজে সে পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

দারোগা আবার অনুমান করলেন, এ কাজ তার সঙ্গী ডাকাতদের দ্বারাও হতে পারে। হয়তো লুটের ভাগ নিয়ে কোন গোলযোগ বেধেছিল। কিন্তু সেনেদের বাড়ীর ডাকাতির সঙ্গেই যদি সে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে ভাঙা দাঁত নিয়ে নিরাপদে মামার বাড়ী ছেড়ে, একেবারে পুলিশের আড্ডার মুখে এল কোন সাহসে? সে যে মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে রূপসা এসেছিল তা তার মামাও স্বীকার করেছে, রূপসার লোকেও স্বীকার করেছে। বস্তুতঃ দারোগার ধারণা পন্ধীকে রূপসাতেই খুন করা হয়েছে। এমনও হতে পারে, মালের ভাগ নিয়ে গোলযোগ হওয়ার ফলে পন্ধী পুলিশের কাছে সমস্ত কথা ফাঁস করে দেবার জন্তেই মদনপুর থেকে রূপসা এসেছিল। সঙ্গীরা হয়তো তাকে অনেক করে থামাবার চেষ্টা করেছিল। হয়তো এখানে সে-ক'দিন একটা মিটমাটের কথা কয়ে তাকে থামিয়েও রেখেছিল। শেষে সুযোগ বুঝে এবং হয়তো কিছুতে তাকে থামানো যাচ্ছে না দেখে শেষ করে দিয়েছে।

দারোগার মনে আবার আশার সঞ্চার হতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ এ সময় পন্ধী রূপসা গেল কেন?

—সামান্ত কিছু টাকা তার একে ওকে ধার দেওয়া আছে। এখন ধান ওঠার সময়। গেলে কিছু আদায় হয়। তাই বলে তো গেল।

দারোগাবাবু আবার জলে পড়লেন। এমনও হতে পারে যে, যাদের কাছে টাকা পাবে, তাদের হয়তো কোনো রূঢ় কথা পন্ধী বলেছিল। তারই প্রতিশোধে তারা এই কাণ্ড করেছে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, কে সব লোক তার কাছে টাকা ধার করেছিল তাদের নাম তুমি জান?

—আজ্ঞে না, বাবুমশাই। আমিও কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি, সেও কোনোদিন বলেনি। তবে রূপসা গেলে হয়তো সন্ধান মিলতে পারে। আমি জানি আমারই টাকা সে ভোগ করবে। তার টাকা যে আমাকে ভোগ করতে হবে, তা কি কোনো দিন ভেবেছি?

কামার আবার চোখ মুছলে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, যারা টাকা ধার নিয়েছে, তাদের সঙ্গে কোনো কথান্তর হওয়ায় তারা এ কাণ্ড করেনি তো?

কামার তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, কি যে বলেন বাবুমশাই! কটাই বা টাকা! তার জন্যে কি আর মানুষ মানুষকে খুন করে?

সেও তো বটে!

দারোগাবাবু আবার তাঁর আগের অনুমানে ফিরে গেলেন। ধারণা করলেন, এ নিশ্চয় তার সঙ্গী ডাকাতদের কাজ। এই সঙ্গী কে বা কারা?

জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, রাধানগরের কুঠিতে কি পঞ্চী একাই কাজ করতে গিয়েছিল, না আর কেউ সঙ্গে ছিল?

—ছিল বই কি! এ গাঁয়ের ক'জনই তো ছিল।

—কত জন ছিল?

একটু থেমে কামার বললে, ভৈরব ঘোষ ছিল, বঙ্কু ডোম ছিল, আর কে ছিল জানি না।

—তারা বাড়ীতে আছে?

—তা বলতে পারব না হুজুর।

—একজন চৌকিদার ডেকে দিতে পার?

তামাসা দেখবার জন্যে ক'জন ছেলে এসে ইতিমধ্যেই উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। তাদের একজনকে দারোগা ইঙ্গিত করতেই সে ছুটে গিয়ে একজন চৌকিদার ডেকে আনলে। খবর পেয়ে আরও কয়েকজন চৌকিদার এসে জুটল। এ জায়গাটা দারোগার নিজের এলাকায় নয়, কাজেই সেখানকার থানার দারোগার কাছে একজন চৌকিদার দিয়ে জরুরী একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। আর সে দারোগা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিজেই তদন্ত আরম্ভ করলেন।

বঙ্কু ডোমকে পাওয়া গেল না। কেউ কেউ বললে, একটু আগে তাকে গ্রামের মধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু তার বাড়ীর লোক বললে, ক'দিন আগে

সে যে চাকরীর খোঁজে কোথায় গেছে কেউ জানে না। বলে গেছে যদি চাকরী পাই তবেই এখন ফিরব, নইলে নয়।

পাওয়া গেল ভৈরবকে। বেচারা কোমরে গামছা জড়িয়ে পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিল, এমন সময় চৌকিদার এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। বেচারাকে স্নান পর্যন্ত করতে দিলে না। তার বাপ-মা এসে বহু কান্নাকাটি করাতে, তাদের বাইরের ঘরে পুলিশ পাহারায় ভাত খাবার অনুমতি দেওয়া হল। বাড়ীতে তাদের তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

ভৈরবের বাবা গ্রামের কয়েকজন মামলাবাজ আইনজ্ঞ লোকের শরণ নিয়েছিল। তারা ইতিমধ্যে নানা অছিলায় দারোগার সঙ্গে দেখা করলে। কিন্তু তিনি সুমধুর হেসেই তাদের উড়িয়ে দিলেন—বললেন, ওর কাছে পঞ্চীর মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জানতে চাই। নানা কারণে এখানে সে সব কথা বলা ওর সুবিধা হবে না। তাই থানায় নিয়ে যেতে চাই। সন্ধ্যের মধ্যে যদি ভৈরব বাড়ী ফিরে নাও আসতে পারে, কাল সকালে নিশ্চয় ফিরবে। দারোগা মধুর বাক্যে ভৈরবের পরিজনকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়ে তাকে নিয়ে থানায় চলে গেলেন।

কি থেকে কি কাণ্ড যে ঘটে কেউ বলতে পারে না। ভৈরব ঘোষ, যাকে নিতান্ত নিরীহ এবং নির্বোধ লোক বলেই সকলের ধারণা ছিল, তার মুখ থেকে যেসব আশ্চর্য রহস্য উদ্ঘাটিত হল, তাতে সবাই অবাক হয়ে গেল। ঠাণ্ডাপানি নয়, বুকে বাঁশ দিয়ে ডলা নয়, টিকটিকিতে বেঁধে চাবুক মারাও নয়, দুটো ধমক দিতেই ভৈরব ফর্ ফর্ করে সকল কথা প্রকাশ করে দিলে। সুখের বিষয়, সে দলের সকল লোককে চিনতো না। কাজেই পঞ্চী কামার, বঙ্কু ডোম, আর রণচণ্ডীর কথাই সে বললে। আর ছিল সে নিজে। আরও দশ-বারো জন লোক ডাকাতিতে ছিল। কিন্তু তাদের কাউকে সে চেনে না, দেখলেও চিনতে পারবে না।

বঙ্কু এর আগে নাকি আরও একটা ডাকাতি করেছে। সে আর পঞ্চী আর কখনও করেনি। পঞ্চীর শরীর দেখে নাকি কোন সর্দার তাকে পছন্দ করে। সে আবার ভৈরব আর বঙ্কুকে জোটায়। ভৈরব আর পঞ্চীর বয়স এক—দু'জনে ভাবও খুব বেশী। এক আখড়ায় কুস্তি লড়ে, আর লাঠি খেলে। সেনেদের বাড়ীর ডাকাতিতেই যে পঞ্চীর দাঁত ভাঙে, সে কথাও সে স্বীকার করে। আঙুল কাটা যায় কার, সে কথা সে প্রথমে স্বীকার করে না।

তারপর চাবুক তুলতেই বঙ্কু ডোমের নাম করে দেয়। কিন্তু বঙ্কু ডোম কোথায় পালিয়েছে তা সে জানে না, বলতেও পারলে না।

পঞ্চীর খুনের কথা সে কিছুই জানে না। সে যে খুন হয়েছে, দারোগার কাছেই প্রথম সে সেকথা শুনলে। পঞ্চীকে খুন করবার কোনো কারণই নেই। প্রথমত সেনেদের বাড়ী থেকে তারা মাল অতি সামান্যই পেয়েছিল। যাও পেয়েছিল, সর্দার ধরা পড়ার পরে আর কেউ দাঁড়ায়নি। যার কাছে যা ছিল, তাই নিয়ে সে সরে পড়ে। মাল ভাগ করা নিয়ে কোনো গোল-যোগই হয়নি।

এক সঙ্গে ডাকাতি করা ছাড়াও পঞ্চী আর ভৈরবে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। কেউ কারও কাছে কোনো কিছু গোপন করতো না। ভৈরব যতদূর জানে, পঞ্চীকে কেউ খুন করতে পারে, এ কথা সে ভাবতেও পারেনি। কারও সঙ্গে তার এতখানি শত্রুতাও ছিল না। তার পেছনে লোক ঘুরছে, কিম্বা তাকে কেউ খুন করতে পারে, একথা ভৈরবকে সে কোনোদিন জানায়নি। পঞ্চীর নিজের মনে তেমন সন্দেহ হলে নিশ্চয় জানাতো।

পুলিশ ভৈরবকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, সে যদি সব কথা স্বীকার করে এবং তার সঙ্গী ডাকাতদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে, তাহলে তাকে সরকারী সাক্ষী করে নেওয়া হবে। মামলার শেষে সে ছাড়া পেয়ে যাবে। অবশ্য প্রথমে যখন সে স্বীকার করে, তখন ভয়েই করেছিল। তখন এ প্রলোভন তাকে কেউ দেয়ওনি, পরে দেয়। কিন্তু পুলিশের প্রলোভনে ভোলবার মতো মন এখন আর তার নেই। তাকে প্রথম যেদিন ধরে আনা হয়, সেদিনও পুলিশ আশ্বাস দিয়ে এসেছিল, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপরে কত ঘণ্টা গেছে, কত দিন, ভৈরবকে ছেড়ে দেবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ-হাজতে থেকে থেকে ক্রমেই সে চালাক হচ্ছিল।

গোড়ায় সে যা বলেছিল, তাতে যথেষ্ট ক্ষতি হত না। সে নাম করেছিল পঞ্চীর, রণচণ্ডীর, বঙ্কু ডোমের আর তার নিজের। এর মধ্যে পঞ্চী তো মরেই গেছে। রণচণ্ডীর কথাও সকলেরই জানা। বাকী সে আর বঙ্কু ডোম। তা বঙ্কু তো ফেরার। আর যা সে বলেছে, তাই যে আদালতে গিয়ে টিঁকবে তারও মানে নেই। মালপত্রের কোনো সন্ধানই ভৈরব দেয়নি। শুধু ফাঁকা কথার আইনের কাছে মূল্য কি?

সেইজন্যেই তাকে সরকারী সাক্ষী করার জন্যে পুলিশের অত সাধাসাধি—কিন্তু এক বেলার জন্যে থানায় এসে যখন দু'সপ্তাহ কেটে গেল অথচ ছাড়া পাওয়ার নাম নেই, তখন আর সে বহু শপথের পরেও পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারলে না। বললে, মালপত্রের কথা কিছুই সে জানে না। নিজে সে গহনা-পত্র কিছুই নেয়নি। কিছু নগদ টাকা পেয়েছিল, তাই নিয়ে বাড়ী এসেছিল। তা সে টাকাও আর নেই, ফুরিয়ে গেছে।

দারোগা কখনও প্রহার, কখনও ভালো ব্যবহার, নানা রকম করেও এর বেশী আর কিছুই আদায় করতে পারলেন না। অবশেষে ভৈরবের শ্বশুর আর বাবাকে ধরলেন। সে বেচারাদেরও ভৈরব ধরা পড়ার পর থেকে আর আহার-নিদ্রা ছিল না। এই ক'দিন ধরে তারা যে কতবার থানা আর ঘর করলে, তার আর ঠিক নেই। ঘুস নিয়ে সাধাসাধি। কিন্তু দারোগার সেই এক কথা—তোমরা যে করে পারো ভৈরবকে দিয়ে সব স্বীকার করাও। মালপত্র কোথায় আছে সন্ধান দিক। রণচণ্ডী আর বঙ্কু কোথায় লুকিয়ে আছে বলুক। নইলে ওর আর নিস্তার নেই—তিনটি বছর ওকে দিয়ে ঘানি ঘুরিয়ে নোব, তবে আমার নাম সামন্ত।

ঘানি-ঘোরানোর কথায় ভৈরবের বাবা আর শ্বশুর ভয় পেয়ে গেল খুব বেশী। ভৈরব নিজেও অবশ্য কম ভয় পেলো না। তার ওপর তার বাবা আর শ্বশুর যেভাবে তার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল, তাতেও সে যথেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ল। ভৈরব রণচণ্ডীর মতো পাকা চোর নয়। সে যে কি করবে স্থির করতেই একটা সপ্তাহ কেটে গেল। এই সময়টা সে কেবলই বলতে লাগল, যা কবুল করেছে তার বেশী আর কিছুই সে জানে না। এই বলে সেও উল্‌টে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু দারোগা তার কাঁদুনিতে ভুললেন না। তিনি স্পষ্টই বললেন, বাপু হে, আমার এক কথা। যা বললাম, সে সব সন্ধান যদি তুমি দিতে পারো, তাহলে তুমিও বাঁচলে আমিও বাঁচলাম। আর যদি না পারো নির্ঘাৎ তোমাকে জেলে পচতে হবে।

ভৈরবের শ্বশুর আর বাবা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল। ভৈরবের যদিও শেষ পর্যন্ত কবুল করতে মন হয়েছিল, কিন্তু আর আর কয়েদীরা তাকে কবুল করতে দিলে না। বললে, দারোগার ফাঁসে পড়েছিস, মরবি বেটা। শেষে একূল-ওকূল দু-কূল যাবে।

তারা ক'জন কয়েদীকে দেখিয়ে বলল, এদের কথা শোন্। এরাও তোর মতো পুলিশের পাল্লায় পড়ে সব কবুল করেছিল। শেষে ফল হ'ল এই যে, আর আর যারা স্বীকার করেনি, তারা পেলে শেষ পর্যন্ত বেকসুর খালাস, আর এই বেটারাই জেল খেটে মরছে।

সে কথায় ভৈরব রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে, চুলোয় যাক গে। যাবলেছি, আর কিছু বলছি না। আমার তো দু'দিকেই বিপদ। বললে রণচণ্ডী মারবে, না বললে পুলিশে মারবে। তবে পুলিশের হাতেই মৃত্যু হোক।

এই বিবেচনা ক'রে সে বাবা এবং শ্বশুরের কান্না শুনেও চুপ ক'রে রইলো। কিছু ফাঁস করলে না। হাজতে মানুষ প্রথম এসেই ভয় পায়, দু'চার দিন থাকলে অতটা ভয় আর থাকে না।

ভৈরবের বাপ আর শ্বশুর বাড়ীতে এসে আছড়ে পড়ল। ছোঁড়াটাকে আর কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না। এক জনকে ধরিয়ে দিতে পারলেও ভৈরব মুক্তি পায়। কিন্তু এ কথা তো বাইরে বলবার উপায় নেই। বাইরের লোকের কাছে ভৈরবের সাধুগিরি নিয়ে এখনও তাদের ঢাল-তলোয়ার ভেঁজে বেড়াতে হয়। এখনও তারা বাইরের লোকের কাছে স্বীকার করে না যে, ভৈরব সত্যিই ডাকাত। তারা বলে, পুলিশের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে নিরীহ বেচারা অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে।

এই কথা তারা বাইরে বলে বেড়ায়। আর ভিতরে চুপি চুপি পরামর্শ আঁটে, কি ক'রে ভৈরবকে খালাস করা যায়। সকলেই তার বোকামির জন্যে যথেষ্ট রেগে গেছে। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! ডাকাতরা তোর কে বাপু? এই যে তুই হাজতে পচছিস, কই তারা তো এসে তোকে সাহায্য করছে না! বাপে আর শ্বশুরে হার মেনে গেছে। শুধু তারা ভৈরবের পায়েই ধরেনি—নইলে রাগ, অভিমান, কান্নাকাটি সবই করে দেখেছে, কিছুতেই তাকে টলাতে পারা যায়নি।

অথচ তাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে বাড়ীর অবস্থা যা হয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। ভৈরবের মা বাইরে বার হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কোথাও একটু নিরিবিলি পেলেই নিঃশব্দে ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলছে—জোরে কাঁদার উপায় নেই। ভৈরবের বৌটি নিতান্ত কচি মেয়ে, মাত্র বছর কয়েক হল তাদের বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তার দিনরাত্র কেবলই ফিট হচ্ছে। কোথাও কেউ

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেও বৌটি চমকে ওঠে, চারিদিকে কেমন এক অদ্ভুত ভীত দৃষ্টিতে চকমক ক'রে চায়, আর দেখতে দেখতে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে চুলে তেল দেয়নি, রুক্ষ চুলে জট বেঁধে গিয়েছে। জোর করে ধরে খাইয়ে দিলে খায়, নইলে খায় না। এই সবের জন্য ভৈরবের শাশুড়ীকে জামাই-বাড়ী আসতে হয়েছে।

এই বৌটির দিকে চাইলে পাষাণেরও প্রাণ গলে যায়। স্বামীর দুষ্কৃতির জন্যে এত দুঃখ, এত লজ্জা, এত মনস্তাপ সইতে হয়! এ দৃশ্য চোখে দেখলে আর কোনো স্বামী ডাকাতি করতে যেতে চাইবে না। বাপ আর শ্বশুরকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে দেখে বৌটি জেদ ধরলে, সে নিজে যাবে। স্বামীর পায়ে ধরে অনুরোধ করবে, আর যেন সে পাপের বোঝা না বাড়ায়।

বাড়ীর পুরুষবর্গ অবাক! বৌ-মানুষ সে যাবে কোথায়! এ কি যাত্রা, না থিয়েটার, যে দেখতে যাবে? শ্মশানেশ্বরের মেলাতেও লোকে এতটুকু বৌ নিয়ে যেতে সাহস করে না। আর এ সাক্ষাৎ জেল! সিপাই-সান্ত্রীতে গম গম করছে। তাদের মাথার পাগড়ী, গালের গালপাট্টা, আর হাতের বন্দুক দেখলেই তো মেয়েমানুষ ভিরমি যাবে।

কিন্তু মেয়েমানুষ একথা শুনেও ভয় পেলো না। বরং ভৈরবের মাও বৌএর সঙ্গে যোগ দিলে। অবশেষে ভৈরবের বাবাকে বাধ্য হয়ে একদিন থানায় যেতে হ'ল।

দারোগা তাকে দেখেই বিরক্ত হয়ে বললে, বাপু তোমাকে তো আমার কথা আগেই বলে দিয়েছি। তবে কি করতে রোজ রোজ আসছ?

ভৈরবের বাবা মেয়েদের দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছা দারোগাকে খুলে বললে। দারোগা অনেক ভেবে দেখলেন, পুরুষদের দ্বারা যা হয়নি, মেয়েদের দ্বারা তা সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে।

কিন্তু মুখে বিরক্তভাবে বললেন, দেখ বাপু, আমাকে ভাঁওতা মেরে অনেক বার ত অনেক রকমে দেখা করলে। এবারও দেখা করতে দিচ্ছি। কিন্তু এই শেষবার। ছেলেকে এবার বাঁচাতে পারলে তো পারলে, নইলে গেলে। আমার কাছে আর কোনো দিন এসো না।

ভৈরবের বাবা খুসী হয়ে দারোগাকে সেলাম করে বাড়ী ফিরে এল।

ফেরার মুখে একবার শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে ধন্নাও দিয়ে এল : মুখ তুলে চাও বাবা! ছেলের সুমতি দাও। এবারে যেন তাকে সব কবুল করিয়ে খালাস করে আনতে পারি।

এ সংবাদ বাড়ীতে এসে জানানো মাত্র, সকলেই জেলে গিয়ে ভৈরবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল—ভৈরবের মা, তার স্ত্রী এবং শেষ পর্যন্ত তার শাশুড়ীও যাবার বায়না ধরল। বাস্তবিকই তারও তো জামাইকে দেখবার ইচ্ছা হয়।

হ'লও তাই। একখানা গরুর গাড়ী ক'রে ভৈরবের বাবা তো সকলকে নিয়ে সদরে রওনা হ'ল। দারোগা আগেই দেখাশোনার ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিলেন, এবং ফলাফল জানবার জন্যে নিজেও উপস্থিত ছিলেন। মেয়েছেলে দেখা করতে এসেছে, আর এই শেষ চেষ্টা বলে দেখা করার ব্যবস্থাও একটু স্বতন্ত্র রকমের করা হয়েছিল। সাধারণতঃ একটা তারের জালের ওপারে থাকে আসামী, এপারে থাকে যারা দেখা করতে আসে তারা। আর জেলের একদল কর্মচারী সেখানে উপস্থিত থাকে। এত দিন পর্যন্ত ভৈরবের বাবা এবং শ্বশুর এইভাবেই দেখা ক'রে আসছিল। এবারে ব্যবস্থা হল স্বতন্ত্র রকমের। একটা নিবিবিলি ঘর ওদের ছেড়ে দেওয়া হল। আর সময়ও দেওয়া হল পুরো এক ঘণ্টা। ঘরে জেলের কেউ থাকবে না, নির্জনে সকল কথা খুলে বলবার সমস্ত সুযোগ দেওয়া হ'ল।

এই ক'দিন হাজত বাসের ফলে ভৈরবের যে চেহারা হয়েছিল, তা দেখে মেয়েরা তো ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। সবাই ভয় পাচ্ছিল, ভৈরবের স্ত্রী না মূর্ছা যায়। বৌএর শরীর যে রকম থর থর ক'রে কাঁপছিল! কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌটি সামলে নিলে, মূর্ছা আর গেল না।

তেলের অভাবে তার মাথার চুলে জট পড়েছে। ক্ষৌরকর্মের অভাবে দাড়ি বড় বড় হওয়ায় মুখখানা কদাকার দেখাচ্ছে। গায়ের চামড়া কর্কশ হয়েছে। তাতে ফাট ধরেছে। দুশ্চিন্তায় চোখ কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার সর্বাঙ্গে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। এখন যে দেখবে সেই বলবে, লোকটা ডাকাত না হয়ে যায় না, তার দুই চোখে এমন একটা নিষ্ঠুরতার জ্বালা ফুটে উঠেছে।

মা ও স্ত্রীর কান্না দেখে ভৈরব একটু ভড়কে গেল। তার নিজের চোখও

মা এবং স্ত্রীর শরীরের অবস্থা দেখে জলে ঝাপসা হয়ে এল। সেই সঙ্গে শাশুড়ীকে দেখে সে খুব লজ্জিতও হল। জায়গাটা শাশুড়ী-জামাই-এ দেখা করার পক্ষে মোটেই মনোরম নয়। মনে তার অনুতাপ এল—ধিক্কার জন্মালো জীবনের প্রতি। ভাবলে, পাঁচজনে প্রলোভনে পড়ে কি দুষ্কর্মই সে করেছে! তার জন্যে তার মা, বাপ, স্ত্রী, আত্মীয়-বন্ধু, কারও মনে সুখ নেই। লজ্জায় কেউ লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারছে না। ওই জীর্ণ, মলিন বস্ত্র পরে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে তার মা ও স্ত্রী—এই ক'দিনেই ওদের দেহের রস কে যেন একেবারে নিঙড়ে নিয়েছে। যদি তার মন্দ কিছু হয়, ওরা হয়তো আর বাঁচবেই না। ভাবতে ভাবতে ওর চোখে জল এল।

ওর বাবা বললে, সবাইকে তোর কাছে এনে হাজির করলাম। তোর অভাবে আমাদের কি অবস্থা হয়েছে নিজের চোখেই দেখ।

বুড়ো কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বললে, তোর মা সেইদিন থেকে অন্নজল ছেড়েছে। ভেবে ভেবে আর না খেয়ে, বৌমার আমার সোণার অঙ্গ কালি হয়েছে। আমার কথা ছেড়ে দে, বয়েস হয়েছে, এখন গেলেই হয়। কিন্তু এদের দেখেও তোর মায়া হচ্ছে না?

মেয়েরা মুখে আঁচল দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কান্না চাপবার চেষ্টা করতে লাগল। বুড়ো আর একবার গলাটা পরিষ্কার করে বললে, পাঁচজনের প্রলোভনে পড়ে অনেকেই ভুল করে, তুইও করেছিস। সে এমন কিছু নয়। এখন তার প্রাচিত্তির কর, করে শুদ্ধ্ হ'।

দারোগার শেখানো কথা বুড়ো গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল। একটু কাজও যেন হল। ভৈরবের চোখের কোণে জল জমেছিল। সকলের থেকে মুখ আড়াল করে সে জলের ফোঁটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিলে।

একটু ভেবে ভৈরব বললে, পুলিশের কথায় বিশ্বাস কি?

ব্যস্তভাবে ওর বাবা বললে, আমার কাছে দারোগাবাবু দিব্যি করেছেন—বাবা শ্মশানেশ্বরের দিব্যি।

ভৈরব মুখ নীচু করে কি যেন ভাবতে লাগল। ওর মা ধীরে ধীরে কাছে সরে এসে, ওর বুকে, পিঠে, মুখে, মাথার চুলে, পরম স্নেহভরে ঠিক ছেলেবেলার মতো হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সে স্পর্শে ওর অকারণে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করছিল। ওদিকে স্ত্রী ঘোমটার আড়াল থেকে

এমন সকরুণভাবে চাইছিল যে, দেখলে বুক ফেটে যায়। কতদিন পরে এদের সে দেখলে!

ওর বাবা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, দারোগাবাবুকে আনব ডেকে? দোব খবর?

ভৈরব নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, দাও।

ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়েছিল। পাচ মিনিটের মধ্যে হাসিমুখে দারোগা এলেন, এবং একদিন যাঁর চাবুকের চোটে ওর পিঠের চামড়া ছিল না, সেই দারোগাই আজ পরমাত্মীয়ের মতো কাছে বসে বলতে লাগলেন, তাই তো বলছি বাবা, আমার কথা শোনো। আমিও তোমার বাপের বয়সী। তোমাকে বাঁচাতেই চাই। বাবা শ্মশানেশ্বরের দিব্যি করে বলছি, সব কথা যদি তুমি বলো, তোমাকে নিশ্চয় ছেড়ে দেওয়া হবে। তোমাকে সরকারী সাক্ষী করে নেওয়া হবে, আর তোমার অপরাধ প্রথম অপরাধ বলে মাপ করে নেওয়া হবে। বাবা শ্মশানেশ্বরের দিব্যি করে বলছি।

বলে উৎসাহের আধিক্যে দারোগাবাবু ভৈরবের গায়ে হাত দিয়েই দিব্যি করে বসলেন।

ভৈরব আর দ্বিধা করলে না। একে একে সকল কথাই বলে দিলে।

তার মধ্যে একটা মজার খবর এই, পক্ষী কামারের বাড়ীর উঠোনে যে তুলসীতলা আছে, তারই নীচে মাল পোঁতা আছে।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছুটল পক্ষীর বাড়ী। গিয়ে দেখে, উঠোনের একপাশে একটা তুলসীগাছ আছে বটে। নিতান্ত নিরীহ একটা তুলসীগাছ। তার নীচে চমৎকার বৃত্তাকার গোময় লেপন। পক্ষীর মামা-মামী আবার পুলিশকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সব চেয়ে বেশী ভয় পেলে, যখন পুলিশ তাদের বাড়ী খানাতল্লাস করার পরোয়ানা দেখালে। অবশ্য দু'খানি মাত্র তাদের ঘর। তার একখানিতে বুড়োবুড়ী থাকে, আর একখানিতে থাকত পক্ষী নিজে। সে ঘরও বুড়োবুড়ীর ভালো করেই দেখা। ঘরে আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। যদি কোথাও পক্ষী কিছু রাখত, তাদের চোখে পড়তই। তবু পুলিশ আসতে দেখলে নিতান্ত নির্দোষ লোকও ভয় পায়।

পুলিশ কিন্তু ঘর দেখলে না। একেবারে সোজা তুলসীতলায় গিয়ে দাঁড়াল। সামন্ত দারোগা প্রথম দৃষ্টিতে দেখে হতাশ হয়ে গেলেন। অন্যান্য পুলিশের লোকও ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলে। ভাবলে, ভৈরব তাদের

সঙ্গে রসিকতা করেছে। সামন্ত দারোগাও হতাশভাবে তুলসীগাছটা নাড়তে নাড়তে কি ভেবে হঠাৎ একটা টান দিতেই মনে হল, স্থানটা যেন নড়ে উঠল! আর আর সকলেও কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। বেশ জোরে একটা টান দিতেই এবারে স্পষ্ট বোঝা গেল জায়গাটা ফাঁপা। নীচে কি যেন একটা আছে।

কয়েকজন কনস্টেবল তখন ধীরে ধীরে টান দিতেই একটা ভাঙা কানেস্তারা সমেত তুলসীগাছটা উঠে এল। দেখা গেল তার নীচে একটা কাপড়ের পুঁটলিতে কি যেন বাঁধা রয়েছে।

তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে! বাজে লোক যারা পাঁচিলের ও-ধার থেকে উঁকি মেরে তামাসা দেখছিল, তাদের সব হাঁকিয়ে দেওয়া হ'ল। কেবলমাত্র খানাতল্লাসীতে যারা সাক্ষী থাকবে এমন কয়েকজনকে রাখা হল।

তুলসীগাছের নীচেয় পাওয়া কাপড়ের পুঁটলী সকলের সামনে খোলা হ'ল। তাতে পাওয়া গেল, এক জোড়া অনন্ত, একটা পুষ্প-হার, কয়েকগাছা চুড়ি, একটা লেসপিন, একটা আকবরী মোহর, একটা সোনার সিন্দুর কৌটো; আর বহুদিনের অব্যবহৃত কয়েক গাছা রূপোর মল। নগদ টাকা একটাও ছিল না। জিনিসগুলো একজন একটা কাগজে টুকে রাখলে, আর তাতে সাক্ষীদের সই করালে। দারোগা ইত্যবসরে সেনেরা হারানো জিনিষের যে তালিকা দিয়েছিলেন, তা খুলে পাওয়া-জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। দেখলেন, একমাত্র আকবরী মোহর, সোনার সিন্দুর কৌটো আর রূপোব মল ছাড়া আর সবই তালিকায় উল্লেখ করা আছে। সম্ভবতঃ কম দামী জিনিসগুলো যে ডাকাতে নিয়ে গেছে, তা সেনেদের খেয়ালই হয়নি। অবশ্য এই জিনিষগুলোই যে সেনেদের জিনিস, সে কথা সেনেদের না দেখিয়ে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। তবে আশা করা যায়, এগুলো তাঁদেরই। কারণ ভৈরবের কথামতো মাল যখন পাওয়া গেছে, তখন তার বাকী কথাও সত্যি হওয়াই সম্ভব।

কতকগুলো বামাল পেয়ে পুলিশের তখন উৎসাহ বেড়ে উঠেছে। তারা দু'খানা ঘর, সংলগ্ন গোয়াল এবং রান্নাঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। লাঠি ঠুকে ঠুকে যেখানে একটু ফাঁপা আওয়াজ হয়, সেইখানেই খুঁড়ে দেখে। এমনি ক'রে ঘর, বারান্দা এবং উঠোনের অর্ধেকটা খুঁড়েও আর

কিছু পেলে না। দারোগাবাবু তুলসীতলার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন।

বাস্তবিক নিরক্ষর পঞ্চী বামাল লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গা আবিষ্কার করেছিল। বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলেও একচুল ফাট দেখা যায় না। গোবর দিয়ে সমস্ত স্থানটি ঝরঝরে তরতরে ক'রে নিকোনো। সব চেয়ে নীচে একটা ছোট গর্ত। তার ওপরে একটা টিনের কানেস্তারার মাপে চার-কোণা ক'রে কাটা। আর তাতেই টিনে মাটি দিয়ে তুলসীগাছ বসানো। সমস্ত কাজ এমন নিখুঁত ক'রে করা যে কোথাও কোন ফাঁক নেই। সম্ভবতঃ পঞ্চী বামাল এনে টিনসমেত তুলসীগাছ তুলে, নীচের ছোট গর্তে সমস্ত জিনিস রেখে, আবার টিনটা পূর্ববৎ বসিয়ে দিত। ধারের মাটি একটু-আধটু খ'সে পড়লেও সকালে একবার নিকিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যেত। সে এমন কিছুই হাঙ্গামার কাজও নয়।

অকস্মাৎ দারোগার ধারণা হ'ল, টিনটা তুলে বামাল রেখে, আবার যথাস্থানে টিনটা স্থাপন করা বিশেষ কঠিন কিছু নয় বটে, কিন্তু তারপরে নিকোনো আছে। এসব কাজ অবশ্য বাড়ীর লোকে জানতে পারবেই। বিশেষ করে পঞ্চীর মামীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্যে এই সম্পর্কে কিছু কিছু জানা মামা-মামীর পক্ষে আশ্চর্য নয়।

কি যে তারা জানতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা দারোগার ছিল না। বিশেষ করে যে লোক মরে গেছে, তার সম্বন্ধে কোন কথা জেনেও লাভ নেই। তবে সেই সম্পর্কে অন্য লোকদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।

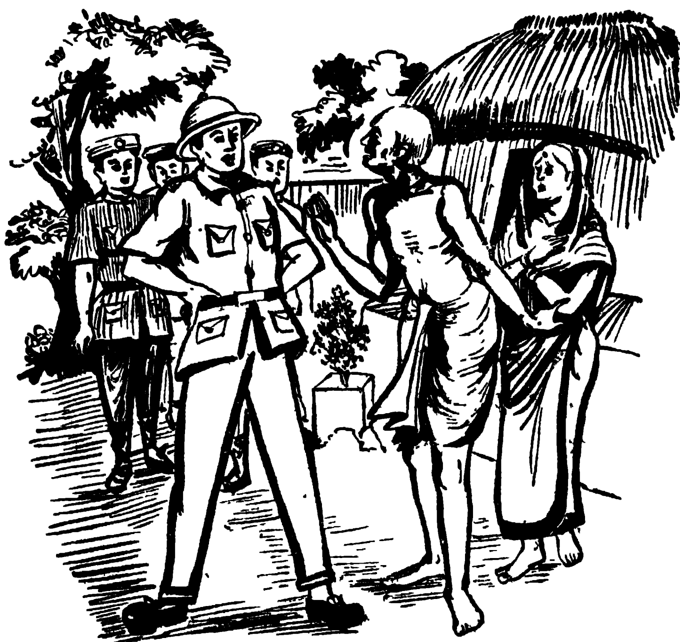
হঠাৎ দারোগার মনে কি যে হল, তিনি বুড়ো মামা আর মামীকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিলেন। মামা-মামী দূরে থাক, কনস্টেবল চৌকিদাররা পর্যন্ত যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। এই বুড়ো আর বুড়ী, চোখে ভালো দেখতে পায় না, কানে ভালো শুনতে পায় না—চুল পেকে শণের নুড়ি হয়েছে, মুখে ত দাঁত বলতে একটি নেই—তারাও কি ডাকাতি করতে গিয়েছিল যে, গ্রেপ্তার করতে হবে? ভাগ্যের দোষে তারা কেন শাস্তি পাবে?

দারোগাবাবু গর্জন করে বললেন, বাঁধো ওদের। হাতে দাও হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি, কোমরে দাও দড়ি।

দারোগাবাবুর হুকুম। পল্টীর মামা-মামী তখন থরথর করে কাঁপছে। একজন কনস্টেবল বুড়োকে বাঁধবার জন্যে এগিয়ে আসতেই, বুড়ো আর্তনাদ করে উঠল, ও বাবা, সেপাই বাবা, আমি কিচ্ছু জানিনে গো, ওই মাগী সব জানে বাবা। ওকেই বাঁধো বাবা।

দারোগার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে আবার গর্জন করে উঠলেন, বাঁধো ঐ মাগীকে।



সে চীৎকার শুনে মামীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। সিপাহীরা বাঁধতে আসছিল। দারোগা ইঙ্গিত করতে আর বাঁধলে না, কেবল বাঁধার তোড়জোড় করতে লাগল। দারোগা বুঝলেন, লোকজন সরিয়ে দিলে হয়ত বুড়ী কিছু কিছু খবর দেবে।

দারোগা যে সব জিনিস পাওয়া গেল, তার একটা তালিকা তৈরী করে তাতে সাক্ষীদের সই নিলেন। থানাতল্লাসীর আরও যেসব কাজ ছিল, সেগুলো শেষ করে তিনি বাইরের লোকদের সব বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এমনকি, একজন জমাদার নিজের কাছে রেখে, বাকী চৌকিদার, দফাদার কনস্টেবলও সব বাইরে মোতায়েন করে রাখলেন।

তারপর বাড়ী একটু নিরিবিলি হলে দারোগা বুড়ীকে বললেন, কি রকম? জেল খাটবার ইচ্ছে আছে, না সব ভালোমানুষের মতো নিজের থেকেই বলবে?

বুড়ো-বুড়ী তখনো থরথর করে কাঁপছে। বুড়োর তো জবাব দেবারই শক্তি নেই। বুড়ীরও ঠোঁট এমন কাঁপছিল, আর গলা এমনি শুকিয়ে গিয়েছিল যে, দারোগাবাবুর উত্তরে সে যে কি বললে, বোঝাই গেল না। শুধু অস্পষ্টভাবে শোনা গেল একটা কথা, শিমূলদীঘি।

দারোগাবাবু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, শিমূলদীঘি? সে আবার কোথায়?

বুড়ী ঘাড় নেড়ে বললে, তা জানিনে।

—সেখানে কে থাকে?

—ওর এক পিসি থাকে।

দারোগাবাবু যেন অথই জলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। কার কথা বলছে বুড়ী? বঙ্কু ডোম? তার পিসির বাড়ীতে সে লুকিয়ে আছে?

জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জানলে কি ক'রে?

ধীরে ধীরে বুড়ীর গলায় স্বর ফিরে আসছিল। বললে, আমাকে বলে গিয়েছে।

বুড়োর আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। দারোগাবাবু বুড়ীর সঙ্গে কথা বলছেন দেখে, সে তখন উঠানেই উবু হয়ে বসেছে। নিরীহ বুড়োমানুষ, ভয়ে তার মাংসহীন হাঁটু আর কেশহীন মাথা এক হয়ে গেছে। বুড়ীর কথায় সে অজ্ঞাতসারেই মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগল।

দারোগাবাবু তার দিকেও একবার আড়চোখে চাইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, বঙ্কা কবে এসেছিল?

বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই চমকে উঠল। বুড়ী বললে, বঙ্কা আবার কি করতে আসবে?

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে, তার কথা বলতে পারব না বাবু।

বুড়ীর ভিতরে ভিতরে বঙ্কার উপর ভীষণ রাগ ছিল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, সে মুখপোড়া আসবে আমার বাড়ী? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো

না? আমার ছেলে ত এমন ছিল না। শুধু ওই হারামজাদার সঙ্গ-দোষেই ত' এমন হয়েছে! আমার বাড়ীতে আর ওকে আসতে দিই?

বুড়োও নিঃশব্দে মাথা নেড়ে এ কথায় সায় দিল।

বুড়ো-বুড়ীর কথা শুনে বিস্ময়ে দারোগাবাবুর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। চোখ কপালে তুলে ভদ্রলোক বিব্রতভাবে একবার বুড়োর দিকে, একবার বুড়ীর দিকে, চাইতে লাগলেন। এরা কি আরবি বলছে নাকি? অথচ কার কথা ওরা বলছে, তাও স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করতে ভয় হচ্ছে। পাছে আবার চেপে যায়।

হঠাৎ বুড়ী দারোগাবাবুর পায়ের ওপর আছড়ে প'ড়ে কেঁদে উঠল, আমার পঞ্চীকে বাঁচান বাবু। সর্বস্ব আপনাকে দিয়ে দোব।

আর পঞ্চী! সে এখন যেখানে, মানুষের সাধ্য নেই সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনে!

দারোগাবাবু চাকরীর খাতিরে বাইরে যত রূঢ়ভাষী নিষ্ঠুরই তিনি হন না কেন, আসলে তাঁর মনটি ছিল নরম। বুড়ী পঞ্চীর নামে কেঁদে পড়তেই তিনি ব্যস্তভাবে পা সরিয়ে নিলেন।

স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, তাকে বাঁচাবার উপায় থাকলে বাঁচাতাম বুড়ীমা। কেঁদে কি করবে বলো?

বুড়ী পা ছেড়ে দিলেও তেমনি করেই শুয়ে রইল। বুড়ীমা বলে ডাকতে একটু সাহসও তার হল। বললে, তুমি মন করলেই সব পারো বাবা। আমি আনিয়ে দিচ্ছি তাকে। তুমি তাকে এবারকার মতো মাপ করো বাবা।

দারোগা যেখানে বসে ছিলেন, সেখান থেকে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, কি বলছো? পঞ্চীকে আনিয়ে দেবে। কোথা থেকে আনিয়ে দেবে?

—তার পিসির বাড়ী থেকে বাবা। বললাম যে শিমূলদীঘি থেকে।

—শিমূলদীঘি থেকে? পঞ্চীকে? তবে কি লাস পঞ্চীর নয়? পঞ্চী বেঁচে আছে?

বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বললে, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে বেঁচেই আছে বাবা। কিন্তু আপনি দয়া না করলে সে আর বাঁচবে না।

বুড়ী দারোগাকে কখনও তুমি বলে, কখনও বলে আপনি।

বুড়ো হাতযোড় ক'রে বুড়ীর প্রার্থনায় যোগ দিলে। আর বললে, পরশু এসেছিল বাবু।

দারোগা ধপ করে বসে পড়লেন। বিস্ময়ে তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

দারোগার অবস্থা দেখে জমাদার বাংলায় বুঝিয়ে বললে, বলছে পরশু পঞ্চী এখানে আসিয়েছিল।

দারোগা অন্যমনস্ক ভাবে তার দিকে চেয়ে বললেন, পরশু এসেছিল? পঞ্চী এখান থেকে তার পিসির বাড়ী গেছে? কোথায় বললে? শিমূলদীঘি? সে কোথায় জানো?

বুড়ো গলা ঝেড়ে বললে, এখান থেকে কোশ চারেক হবে বাবু। সিধে পচ্চিমে।

—ক্রোশ চারেক? সিধে পশ্চিমে?

দারোগাবাবু প্রাপ্ত বামাল আর তার তালিকা জমাদারের জিম্মা করে দিয়ে থানায় ফিরে যেতে বললেন। আর তাঁর বাসার খবর দিতে বললেন। বললেন যে, তাঁর ফিরতে দু'তিন দিন দেরী হবে।

উত্তেজনার আধিক্যে ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো কথা পঞ্চীর পিসেমশায়ের নাম কি।

বুড়ো হাতযোড় করে বললে, পরাণ কর্মকার। মাঝপাড়াতে বাড়ী।

আচ্ছা, বলে অন্যমনস্কভাবে শিস্ দিতে দিতে দারোগা ঘোড়ায় চড়লেন।

এত বড় বিস্ময়ের জন্যে দারোগাবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। এতদিন ধরে যে অনুমানের বলে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার কিছুই কি টিকলো না? লাস পঞ্চীর নয়, মাদুলির মিল থাকা সত্ত্বেও নয়। আশ্চর্য! সে লাস যে কার তাই এখনও সনাক্ত হল না? ও ব্যাপারেও নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় চক্রান্ত আছে। নইলে কার লাস তা নিশ্চয় এতদিনে তারই কোনো আত্মীয়-স্বজন এসে জানিয়ে যেত। সে চুলোয় যাক, এখন পঞ্চীকে পেলে হয়! রণচণ্ডীর বিষ দাঁত না ভাঙ্তে পারলে তাঁর আর শান্তি নেই।

শিমূলদীঘি ক্রোশ চারেক দূরে, পশ্চিমে। সুতরাং থানাটা হোসেনাবাদ হওয়া সম্ভব। এই অনুমান করে তিনি হোসেনাবাদ গেলেন প্রথমে। সেখানে থানায় কথা কয়ে জানলেন তাঁর অনুমান ঠিক। থানার কর্মচারীদের সকল কথা বলে তিনি তাদের সাহায্য চাইলেন। রাত্রি না হওয়ার কিছু

ছিল না। কেবল হোসেনাবাদ থানার দারোগা তাঁকে স্নান আহারের অনুরোধ করলেন।

কিন্তু সামন্ত মহাশয় স্নানাহারে রাজি হলেন না। তাতে অনেক বিলম্ব হবে। ইতিমধ্যে যদি তার মামার বাড়ী থেকে কোন খবর পেয়ে পক্ষী সরে পড়ে, আবার তিনি বিশ-বাঁও জলে পড়বেন। হোসেনাবাদের দারোগা স্নানাহার সেরে তাম্বুল চর্বণ করছিলেন। সামন্তের জেদ দেখে অগত্যা তিনি তাড়াতাড়ি পোষাক পরে এলেন। আর সঙ্গে নিলেন জন দশেক সশস্ত্র সিপাই।

এই বাহিনী নিয়ে সকলে মিলে যখন রওনা হলেন তখন প্রায় দুটো। আশার কথা, শিমূলদীঘি এখান থেকে মাত্র মাইল দুই। সুতরাং পৌছতে আড়াইটে, বড় জোর তিনটের বেশী হবে না। শিমূলদীঘির একজন চৌকিদার সেদিন থানায় হাজ্রিরা দিতে এসেছিল। সে সঙ্গে চলল।

সামন্ত তো সদলবলে গিয়ে পরাণের বাড়ী ঘেরাও করলেন।

পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাবে গ্রামের লোক একসঙ্গে বিস্মিত ও ভীত হয়ে উঠল। পরাণের বাড়ীর লোকের তো কথাই নেই। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ বাড়ীর চারিদিকে মোতায়েন করে রাখা হল, যেন কোনো দিক দিয়ে কেউ পালাতে না পারে। আর দু'জন দারোগা কয়েকজন পুলিশ নিয়ে বাড়ীর ভিতরে চড়াও হলেন। তাঁরা কেবল এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় একটা অমানুষিক হুঙ্কার উঠল। ভিতরের পুলিশ ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই বাইরের পুলিশ হৈ হৈ করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো বন্দুকের আওয়াজ হল। ব্যাপার গুরুতর ভেবে সমস্ত পুলিশ বাইরের দিকে ছুটল। আহত মানুষের অব্যক্ত আর্তনাদে, পুলিশের সোরগোলে বাইরেটা তখন সরগরম।

সামন্ত দারোগারও ছুটে গিয়ে ব্যাপারটা দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু সব পুলিশ বাইরে চলে গেল, ভিতরে কেউ রইল না দেখে তাঁর কি মনে হল, তিনি আর নড়লেন না।

হঠাৎ তাঁর মনে হল গোয়ালঘরের ভিতর থেকে কে যেন বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে খিড়কীর দিকে গেল। রিভলভারটা বাগিয়ে তিনি সঙ্গেসঙ্গে তার পিছু নিলেন।

খিড়কীর পিছনে একটা ছোট পুকুর। চারিদিকে তার বাঁশবন। তারপরেই কয়েক বিঘা ধানের ক্ষেত। তার নীচেই নদী।

দারোগা তার পিছু পিছু খিড়কী পেরিয়েই দেখেন একটা লোক বাঁশবন পার হয়ে কেবল ধানের ক্ষেতে নামবার চেষ্টা করছে। তিনি আকাশে একটা গুলি ছুঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন, খবর্দার!

আচম্‌কা গুলির আওয়াজ এবং মানুষের হুঙ্কার শুনে লোকটা পিছু ফিরতেই চারি চক্ষের মিলন।



দারোগা সবিস্ময়ে দেখলেন, লোকটা আর কেউ নয়···

রণচণ্ডী স্বয়ং!

রিভলভার সমেত দারোগাবাবুর হাতটা কেঁপে উঠল।

রণচণ্ডী আর মাঠে নামল না। এক গাল হেসে হাতের লম্বা লাঠিটা ডোবার জলে ফেলে দিয়ে সেই বাঁশবনে বসে মাথার পাগড়ী খুলে নিশ্চিন্তভাবে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

দারোগার পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে এমনি নিশ্চলভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁর অবস্থা দেখে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পাগড়ীর ফাঁক দিয়ে মিট মিট করে চেয়ে রণচণ্ডী যেই ফিক করে হেসে ফেললে অমনি তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন, হুঁশিয়ার! উঠেছ কি মরেছ!

এমন অস্বাভাবিক জোরে তিনি চীৎকার করলেন যে, তাঁর নিজের কানেই বিসদৃশ ঠেকল। রণচণ্ডীও বোধহয় তাঁর অবস্থা দেখে আমোদ অনুভব করলে। সে যেন দারোগাকে পরিহাস করবার জন্যেই চোখ মটকে হাসলে।

তার সঙ্গে একা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দারোগা যে শেষ পর্যন্ত কি করতেন বলা শক্ত। তাঁর হাত যে রকম কাঁপছিল তাতে পট করে গুলি করাও বিচিত্র নয়। চোখে তাঁর পলক পড়ছিল না।

ওদিকের গোলমাল তখন শান্ত হয়ে এসেছে। আর কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না। একজন সিপাই এসে দারোগাবাবুকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ যাত্রায় সকলে সশস্ত্র এসেছে। তার হাতেও একটা রিভলভার। বললে, বাবুজি, চোর পাকড় গিয়া।

দারোগা তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। তিনি যেমন একদৃষ্টে রণচণ্ডীর দিকে চেয়ে রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি রইলেন। শুধু বললেন, আউর সিপাহী বোলাও।

সিপাই একটা বাঁশী বাজাতেই আরও তিন-চারজন সিপাই ছুটে এল। তারাও সশস্ত্র।

দারোগাবাবু আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে হাঁকলেন, হাত উঠাও।

সমস্ত ব্যাপারটাই রণচণ্ডীর কাছে যেন একটা রসিকতা। সে তেমনি মিটি মিটি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তুললে। হাতকড়ি সঙ্গেই ছিল। সিপাই ক'জন গিয়ে রণচণ্ডীর হাতে ডবল হাতকড়ি বেশ শক্ত করে পরিয়ে দিলে। তারপরে তার কোমরে আর একটা দড়ি বেশ শক্ত করে বেঁধে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল কামারের বৈঠকখানায়, যেখানে একটু আগে পঞ্চীকে এনে বাঁধা হয়েছে।

সিপাই রণচণ্ডীকে যত টানতে টানতে আনে সে তত হাসে। আর তার হাঁটার ভঙ্গি কি! যেন হেলে-দুলে বরকর্তা চলেছেন!

গুলি পঞ্চীর পায়ে লাগেনি। বস্তুতঃ পুলিশে রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করেছিল। তাতেই ভয় খেয়ে পঞ্চী হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে।

কিন্তু বুদ্ধিটা তারা মন্দ করেনি। হয়তো অনেকদিন আগে থেকেই এ মতলব তারা ভেঁজে রেখেছিল। উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে অপায় চিন্তা করে রাখা ভালো।

পরাণ কামারের বাড়ীর এক প্রান্তে যে গোয়ালঘর, পুলিশের সাড়া পেয়ে পঞ্চী তারই উপর চড়ে। বোঝা যাচ্ছে সর্দারকে বাঁচাবার জন্যে সে নিজে ধরা দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। যেভাবে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করেছিল তাতে দু'জনের বাঁচা অসম্ভব ছিল। তবু যদি একজন বাঁচে। এই ভেবে পঞ্চী লাঠিতে ভর করে, একটা ডাকাতি হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে, একেবারে পুলিশের মাথা ডিঙিয়ে রাস্তার ওধারে পড়ে। ইচ্ছা, তার হুঙ্কার শুনে আর তাকে দেখে সব পুলিশ যদি তাকেই তাড়া করে তাহলে সর্দার পিছনের খিড়কী দিয়ে চুপি চুপি পালাতে পারে। সামন্ত দারোগা যদি ভাগ্যক্রমে কৌতূহল দমন করে ভিতরেই না থাকতেন তাহলে সত্যিই সর্দার নিরাপদে পালাতে পারত। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

পঞ্চী অবশ্য ধরা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই লাফ দিয়েছিল। দিনের বেলায় অতগুলো পুলিশের মাথা ডিঙিয়ে পলায়ন করা সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু পঞ্চী নিজেও জানত না সে এত বড় জোয়ান-মরদ। যেভাবে লাফ দিয়ে সে পালিয়েছিল তাতে গুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে একটা শিকড়ে পা আটকে পড়ে না গেলে পুলিশের সাধ্য ছিল না তাকে ধরে।

কিন্তু এ জন্যে সে দুঃখিত ছিল না। কারণ তার মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে, সর্দার নিশ্চয়ই নিরাপদে পালিয়েছে। দুঃখিত না হওয়ার আরও কারণ ছিল। এভাবে পেচকের মতো দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতে আর সে পারছিল না। তার মামা-মামীকে এই কথাই সে বলে এসেছিল। পঞ্চীর জীবনের উপর ঘৃণা হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল এর চেয়ে জেলখাটা ভালো। রণচণ্ডী সঙ্গে না থাকলে সে হয়তো কোনদিন বাড়ী ফিরে যেত। তাতে পুলিশ তাকে ধরুক, আর যাই করুক। শুধু সর্দারের ভয়েই পারেনি।

আর কী সে জীবন! এই দুটো মাস দিনরাত্রি তার কি ভাবে কেটেছে সে কথা ভাবতেও পঞ্চীর শরীর শিউরে ওঠে। দেড়টা মাস তো তাদের পথে-পথেই কেটেছে। শীতকালে দিনের বেলা ঘোরা কষ্টকর নয়। কিন্তু দিনে রাস্তায় বার হওয়ার তো উপায় নেই। পঞ্চীকেও অনেকে চেনে, রণচণ্ডীর তো কথাই নেই। তাছাড়া পথে-ঘাটে-স্টেশনে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'তেই বা কতক্ষণ! আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়ারও উপায় নেই। কার কোথায় আত্মীয় আছে সে সন্ধান পুলিশ আগে নেয়, আর সেই সব জায়গায় গিয়ে হানা দেয়। আর অপরিচিত লোকই বা তাদের আশ্রয় দেবে

কেন? এমনি করে তারা দু'জনে পুরো দেড়টি মাস পথে পথে ঘুরেছে। কোনোদিন দুটি জুটেছে, কোনোদিন এক আঁজল জল খেয়েই কাটাতে হয়েছে। পথে কোনোদিন কোনো আত্মীয়ের বাড়ী একটা রাত্রি হয়তো কেটেছে, আবার সূর্য ওঠবার আগেই পরিচিত লোকালয় ছেড়ে বনে বনে ঘুরতে হয়েছে। মাঝে মাঝে হয়তো উপরি উপরি দু'তিন দিন অনাহারে থাকার পর কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও কানা ভিখারী সেজে অপরিচিত লোকালয়েও যেতে হয়েছে। কখনও আশ্রয় মিলেছে, কখনও মেলেনি। পঞ্চীর অবশ্য রণচণ্ডীর মতো গা-ঢাকা দেবার প্রয়োজন হয়নি। দাঁতটা বাঁধানোর পরে আর ভাঙা বলে বোঝাও যেত না। কিন্তু সেই দাঁত হঠাৎ একদিন যায় হারিয়ে। তখন রণচণ্ডী আর তাকে বাড়ীতে থাকতে দেয় না, পাছে ধরা পড়ে-যায় এই ভয়ে। কারণ পুলিশে তখন দাঁত-ভাঙা আর আঙুল কাটার সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে।

তবে সুবিধা হল যখন কার একটা লাস পঞ্চীর বলে সনাক্ত হল। খুনের জন্যে চণ্ডী দায়ী না হলেও বুদ্ধি করে লাস সরায় সেই। কারণ তা হলে আর লাস সনাক্ত হবে না, পঞ্চীর বলেই চলে যাবে। কি করে সে লাস সরালে সে যদি শোনো তো অবাক হয়ে যাবে। চণ্ডী তখন পঞ্চীর রূপসার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। পঞ্চীর বাঁধানো দাঁত, সুতরাং ভয় নেই। দারোগা কি করছে, না করছে সব সংবাদ সে পায় আর সর্দারকে জানায়। এমন সময়, একদিন বাড়ী থেকে টাকা-কড়ি আনবার জন্যে পঞ্চী মদনপুর গেছে, হঠাৎ রণচণ্ডী বাড়ীতে লুকিয়ে থেকেই শুনলে, পঞ্চী খুন হয়েছে আর তার লাস নদীতে ভাসছে। শুনে তার হাসি পেলে আর একটা দুর্বুদ্ধিও জাগল। রাত্রে চুপি চুপি বেরিয়ে দেখলে নদীর ঘাটে কড়া পাহারা। একটা হাঁড়ির মাথায় সে দুটো ফুটো করলে, যাতে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুবিধা হয়। তারপর সেই হাঁড়ি মাথায় দিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে যে ঘাটে মড়া ছিল সেই ঘাটে এসে ঠেকল। তাকে সেই অবস্থায় পুলিশে দেখেছে কি না কেউ জানে না। দেখলেও তারা নিশ্চয় চিনতে পারেনি। ভেবেছিল একটা কেলে-হাঁড়ি এমনি ভাসতে ভাসতে আসছে। চণ্ডী মড়ার যে অংশ জলের মধ্যে ছিল তাতে দড়ির একটা দিক বেঁধে যেমন চুপি চুপি এসেছিল তেমনি চুপি চুপি সরে পড়ে। তারপর দূর থেকে দড়িতে টান দিতেই মড়া ধীরে ধীরে সরতে সরতে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরে যেমন করে গুণ-টানে তেমনি করে দড়ি

ধরে চণ্ডী মড়া টেনে নিয়ে রণ-পায়ে ছুটতে লাগল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সে বহুদূর চলে গিয়ে লাস এমন জঙ্গলে পুঁতে দিলে যে তার সন্ধান পাওয়া কঠিন।

লাস যখন তার বুদ্ধিবলে সত্য সত্যই পঞ্চীর বলে চলে গেল তখন অনেকটা সুবিধা হল। কারণ তখন আর কেউ পঞ্চীর খোঁজ করবে না। তার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী দু'জনেরই লুকিয়ে থাকা চলবে। সেই বুদ্ধি করে তারা পঞ্চীর পিসির বাড়ী আশ্রয় নিলে এবং দু'তিন সপ্তাহ অনেকটা সুখেই কাটাল।

আগে তো দু'জনের সন্ন্যাসীর মতো অবস্থা হয়ে উঠেছিল। মাথার চুলে জট পড়েছে, মুখে একমুখ দাড়ি,—ধুলায় ধূসর। তাতে একটা সুবিধা এই ছিল যে, লোকের চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পিসির বাড়ীর আরাম পেয়ে ওদের দু'জনের আর ইচ্ছে হল না যে অন্য কোথাও যায়। সুতরাং বাইরে বার হবার প্রয়োজন নেই দেখে দু'জনেই মাথায় চুল আর দাড়ি কামিয়ে ফেললে। দেড় মাস গায়ে একবিন্দু তেল না পড়ায় চামড়ার যা হবার তাই হয়েছিল,—অর্থাৎ অবস্থা হয়েছিল চোৎ মাসের ক্ষেতের মতো। দু'জনে তো তেল মেখে স্নান করে বাঁচল,—কিন্তু দিনে নয়, রাত্রে। শীতকালে রাত্রে স্নান করা সুখের নয়, প্রত্যহ করাও যায় না। কিন্তু উপায় কি? পরাণের গোয়াল ঘরের মাচায় কাঠ-ঘুঁটে আরও কত কি থাকে। তারই ওপাশে একটুখানি জায়গা পরিষ্কার করে দু'জনে থাকে। অবশ্য লেপ-বিছানা-বালিশ আছে। একে মাচার উপর, তাতে কাঠ-ঘুঁটে আরও কত জঞ্জালের স্তূপের আড়ালে, জায়গাটা নিরাপদ সন্দেহ নেই। শীতকাল, সুতরাং সাপ-খোপের ভয় অবশ্য নেই। কিন্তু বিছে আছে। আর কতদিন যে কামড়েছে তার শেষ নেই। অসহ্য যন্ত্রণা, তবু চীৎকার করার উপায় নেই। তাহলেই লোক জানাজানি হবে।

দিনে থাকত মাচার উপর। নামবার উপায় ছিল না। সেইখানেই তাদের খাবার দিয়ে যেত। পল্লীগ্রামের ব্যাপার। বাড়ীতে লোক যাতায়াত আছেই। নামলেই কারও না কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ওরা বেরুত রাত্রে। রাত্রে বেশ করে তেল মেখে স্নান করত। মনের আনন্দে উঠোনে পায়চারী করত। একটু দৌড়-ঝাঁপ করে শরীরের আড় ভেঙ্গে নিত। কোনো কোনো দিন এক্সারসাইজ করবার জন্যে মাঠের দিকেও

বেড়াতে বার হত। আর ভোর হবার আগেই এসে মাচায় শুয়ে পড়ত। এক কথায় দিনকে করেছিল রাত আর রাতকে দিন।

এইভাবে থাকায় শরীরে অবশ্য আগের মত ফাট আর ফাটলো না, কিন্তু রং হয়ে গেল চীনেম্যানের মতো হলদে। সূর্যের আলো মানুষের দেহে যে লাবণ্য আনে সে লাবণ্য আর রইল না।

এমনি অবস্থায় দু'জনে ধরা পড়ল।

এবারে আর দারোগাবাবু এদের গ্রেপ্তার করার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। তখনই তাদের দু'জনকে বেশ শক্ত করে বেঁধে হোসেনাবাদ থানায় নিয়ে এলেন। রাত্রে তারা সেখানকার হাজতে থাকল। রণচণ্ডীর নাম শোনেনি এমন দারোগা এদিকে নেই। সুতরাং হাজতে অতিরিক্ত রকম কড়া পাহারায় ব্যবস্থা হল। সামান্য কিছু আহারাদিও তাদের রাত্রের জন্য দেওয়া হল।

সামন্ত দারোগা বহুদিন পরে আজ তিনি তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। রণচণ্ডী যেদিন তাঁর হাত থেকে পলায়ন করলে সেদিন থেকে তাঁর আহারের রুচি গিয়েছিল চলে, চোখে ঘুমও ছিল না। নিতান্ত না খেলে নয় তাই খেতে বসতেন।

বহুদিন পরে হোসেনাবাদ থানায় হাজতে রণচণ্ডীকে পুরে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। রণচণ্ডীকে ধরার আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পক্ষীকে ধরতে গিয়ে সেই সঙ্গে ধরা পড়ল রণচণ্ডী। এত বড় সৌভাগ্যের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বহুদিন পরে হোসেনাবাদ থানায় দারোগাবাবু তাস খেলতে বসলেন। তাঁর অট্টহাস্যে সেদিন ঘরের দেওয়াল ফাটবার মতো হয়েছিল।

তবু ভয় যে একেবারে গিয়েছিল তাও নয়। বার বার তার কাছে ঠকে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, চণ্ডী সব পারে। তাস খেলতে খেলতেও সামন্ত বার বার উঠে গিয়ে দেখে আসছিলেন ওরা পালালো কিনা।

যে ডাকাত ধরা পড়ে মুসড়ে যায় তাকে পুলিশ তত ভয় পায় না। কিন্তু যারা ধরা পড়ার পরেও ভড়কে যায় না, সামনে হাসি-ঠাট্টা রসিকতা করে তাদের জন্যেই পুলিশের উৎকণ্ঠা। দারোগা যখনই হাজতে রণচণ্ডী আর পক্ষীর খোঁজ করতে গেছেন, দেখেন চণ্ডী চিৎ হয়ে শুয়ে তার ভাঙা, কর্কশ

কণ্ঠে পরমানন্দে গান গাইছে। পঞ্চীর এই প্রথম হাজতবাস। তার তত সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না।

চণ্ডী মাঝে মাঝে গান থামিয়ে তার সাড়া নেয়।

—কি রে বেটা, মলি না কি ?

পঞ্চী জবাব দেয়, না।

—গান শুনছিস ?

এবারে পঞ্চী হাসে। বললে, শুনছি !

—কেমন ?

—বেশ।

রণচণ্ডী তার উত্তরে খুশী হয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে। সে শব্দে বাইরের সিপাহীরা পাহারা দিতে দিতে চমকে ওঠে।

অন্ধকার ঘর। কেউ কাউকে দেখতে তো পাচ্ছে না। এমনি করে সাড়া নেয়। কখনও বা চণ্ডী হাতড়ে হাতড়ে পঞ্চীর মাথাটা খুঁজে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, আর কত সান্ত্বনার কথা বলে। পঞ্চী কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু তার ফোঁপানির শব্দ বাইরে থেকেও শোনা যায়।

রণচণ্ডীর এ সব বালাই নেই। বাইরে এক সময় সামন্ত দারোগার গলা পেয়ে সে হাঁকলে, ও মশাই ! দারোগাবাবু, দারোগাবাবু !

দারোগাবাবু চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কি ?

—এইদিকে একটু শুনুন না ছাই !

দারোগাবাবু শিক দেওয়া লোহার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছ ?

—বড্ড মশার উপদ্রব। বুঝলেন ? একটা মশারি-টশারীর ব্যবস্থা নেই ? একটা হলেই দু'জনের হয়ে যাবে।

দারোগা হেসে ফেললেন। হাতের চাবুকটা দেখিয়ে বললেন, পাবে বই কি ! কাল পাবে।

দারোগার হাতের চাবুক যেন একটা মস্ত বড় রসিকতার ব্যাপার, এমনিভাবে হেসে রণচণ্ডী বললে, দেবেন বই কি ! এখন একটা বিড়ি দিন না মাইরি ! বড্ড ইচ্ছে হয়েছে।

দারোগা তো অবাক। একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে গট্ গট্ করে তিনি চলে গেলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

পিছন থেকে ভেংচি কেটে রণচণ্ডী বললে, কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি? শুনছেন!

কিন্তু দারোগা আর শুনলেন না। চণ্ডী হো হো করে হেসে উঠল।

হোসেনাবাদের দারোগা একজন আসামীর এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারছিলেন না। সামন্তকে বললেন, দোব নাকি বেটাকে ঘা কতক?

—চুপ। বলে সামন্ত তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি ওকে চেনেন না। এই চার জেলার যত দুর্দান্ত লোক আছে অনেকে ওর সাকরেদ। যারা সাকরেদ নয়, তারাও ওকে গুরুর মতো মানে। তার ওপরে ও নিজেও বোধহয় যাদু জানে। ওকে যতক্ষণ না সেণ্ট্রাল জেলে পুরছি ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

হোসেনাবাদের দারোগা কথাটা বিশ্বাস করলেন না। রণচণ্ডীর চেহারা দেখলে তা বিশ্বাসও হয় না। বরং পঞ্চীকে দেখলেই অনেকটা ডাকাত বলে মনে হয়।

হোসেনাবাদের দারোগা একটু ফিক্ করে হেসে বললেন, যাদু জানে কি রকম? দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে পালাবে না কি?

কিন্তু সামন্ত তাঁর রসিকতায় যোগ দিলেন না। বললেন, বিশ্বাস নেই। ও সব পারে।

তবু ভদ্রলোকের বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে, সামন্ত তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বললেন। দারোগা তো শুনে হেসেই অস্থির। বললেন, তাহলে লোকটির শরীরেও শক্তি যেমন আছে, মাথায়ও বুদ্ধি তেমনি আছে।

সামন্ত বললেন, এবারকার অভিজ্ঞতা থেকেও কি তা বুঝতে পারলেন না? কি চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়েছিল বলুন তো? আপনাদের চীৎকার শুনে আমি যদি বাইরে যেতাম আর কি ওর সন্ধান পাওয়া যেত?

একটু থেমে সামন্ত হেসে বললেন, আমাদের দশ বছরের মাইনে ও এক এক রাত্রে রোজগার করেছে। অথচ শুনলে আশ্চর্য হবেন, একটি তামা ওর হাতে নেই।

অবিশ্বাসের সঙ্গে হোসেনাবাদের দারোগা বললেন, কি যে বলেন!

—সত্যিই তাই। ওর মামলা চলবার সময় দেখবেন একটা উকিল পর্যন্ত দিতে পারবে না।

—কি রকম?

সামন্ত হেসে বললেন, ওই রকম। ডাকাতে সমস্ত জীবন ধরে যে রোজগার করে তা একটা রাজার ঐশ্বর্য। কিন্তু একটি পয়সা ওদের নিজেদের ভোগে লাগে না। নগদ টাকা যা পায় তা ফেরার অবস্থাতেই খরচ হয়ে যায়। আর গহনাপত্র দোকানে বিক্রী করতে গেলেই তো ধরা পড়বে। কাজেই এক শ্রেণীর চালাক লোকে ওদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকার গহনা পাঁচ টাকায় কেনে। যে কেনে তার তো সমস্তই লাভ, যে দেয় সেও ভাবে যা পাই তাই লাভ।

সামন্ত হেসে বললেন, এই রণচণ্ডী যখন আমার হাত থেকে পালায় তখন ওর বাড়ী ঘর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করার হুকুম হয়। স্থানীয় দারোগা ক্রোক করতে গিয়ে দেখেন একখানা কুঁড়ে ঘর ছাড়া ওর আর কিছুই নেই। তারও চালে খড় নেই। ওর একটি ছেলে। সে পৃথকান্ন, এবং সৎভাবে জীবনযাপন করে বলেই বোধহয় এক-আধ বিঘে জমি করেছে। দু' সন্ধ্যে দু' মুঠো খাওয়াও তার জোটে, কিন্তু ওর বাপ যে হয়তো সমস্ত জীবন ভরে লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে তার চালে খড় নেই। ভাবতে পারেন? এই কেসেই যদি ওর ছ' সাত বৎসর জেল হয়, বেরিয়ে এসে কি করবে বলুন তো? তখন এমন বুড়ো হয়ে যাবে যে ডাকাতি করতে পারবে না। কী করবে তবে? আমি এই রকম আরও একজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে জানি। বেচারার এখন চোখ গেছে। ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করে। ডাকাতদের শেষ পরিণতি প্রায়ই এই হয়।

দু'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রাত তখন প্রায় বারোটা। অন্ধকার রাত্রি। কষ্টিপাথরের মতো কালো আকাশে আকাশভরা তারা, হীরের কুচির মতো জ্বলছে। থানার বারান্দায় অন্ধকারে দু'জনে গল্প করছিলেন। রাত যে এতটা হয়েছে কথায় কথায় তা খেয়াল হয়নি।

অকস্মাৎ হাজত ঘরের দিক থেকে এক গোঁ গোঁ শব্দ উঠল, এবং একজন হিন্দুস্থানী সিপাই ছুটতে ছুটতে এসে বললে, বাবুজি, আসামী কো বেমার হুয়া হৈ।

শুনেই সামন্ত হেসে উঠলেন। বললেন, এই আরম্ভ হল।

সিপাহীর দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা, তুম যাও। উ কুছ নেহি হৈ।

সিপাই সেলাম ঠুকে চলে গেল।

সামন্ত বললেন, ওর বহু রকম ব্যাপার আছে। কখনও মৃগী রোগীর মতো

এমন করবে যে, আপনার সাধ্য নেই ওকে না ছেড়ে দিয়ে পারেন। ওর গোঙানি, ওর কাৎরানি চোখে দেখা যায় না এমন করুণ।

আধঘণ্টা পরে দু'জনে যখন শুতে যাওয়ার জন্যে উঠছেন, তখন সিপাই আবার হন্তদন্ত হ'য়ে এসে বললে, বাবু, উ আসামী জরুর মর্ যায়েগা। উ জহর পিয়া হৈ!

বিষ খেয়েছে! দারোগা হো হো করে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কে বলেছে?

সিপাই তেমনি ভীতিবিবর্ণ মুখে উত্তর করলে, ওর সঙ্গে আর যে একজন আসামী আছে সেই জানিয়েছে।

দুই দারোগাই তাকে হাতের ইসারায় চলে যেতে বলে সহাস্যে বললেন, ও সব ওর চালাকি। তোমরা ভয় পেও না।

চালাকি শুনে সিপাই অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেল। রাত হয়েছে দেখে দারোগা দু'জনও শুতে গেলেন।

তারপরে—বোধ হয় ঘণ্টা তিনেকও হয়নি,—সামন্তের দরজায় করাঘাত পড়ল। রণচণ্ডীর চিন্তায় দারোগাবাবুর সুনিদ্রার উপায় ছিল না। তিনি দরজায় করাঘাত পড়তেই চম্‌কে উঠলেন,—কি ব্যাপার?

সিপাই রুদ্ধশ্বাসে বললে, বাবুজি, আসামী মর্ গিয়া!

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে সামন্ত বললেন, মর্ গিয়া? কেইসে সম্‌ঝা?

সিপাই নিজে কিছুই সমঝায়নি। ওতো বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। ভেতর থেকে পক্ষী বলেছে। সিপাই নিজে শুধু এইটুকু দেখেছে যে, রণচণ্ডী নড়ছেও না, চড়ছেও না। সামন্ত বিরক্তভাবে কোটটা গায়ে দিলেন, রিভলভারটা গুলি ভরে হাতে নিলেন। দেখতে দেখতে ব্যস্তভাবে হোসেনাবাদের দারোগাও ছুটে এলেন। ঝঞ্চাট তো তাঁরই কি না। তাঁরই হাজতে আসামী মরেছে। দু'জনে সশস্ত্রভাবে হাজতে গেলেন, রণচণ্ডীর নতুন ফন্দিটা জানতে।

লোহার শিক-দেওয়া দরজার বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছিল, রণচণ্ডী চোখ অর্ধনিমীলিত করে চিৎ হয়ে স্থিরভাবে শুয়ে। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্তমিশ্রিত যে লালাস্রাব হয়েছিল তা তখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। সামন্ত দারোগা বোধহয় ধৈর্যের শেষ সীমায়

পৌঁছেছিলেন। চণ্ডীকে বুটের একটা গুঁতো দিয়ে হুঙ্কার করলেন, এই শূয়ার!

চণ্ডী যেমন ছিল তেমনি শুয়ে রইল। হোসেনাবাদের দারোগা ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি ওর নাকে হাত দিয়ে দেখেন নিঃশ্বাস বন্ধ। বুকেরও স্পন্দন নেই। নাড়ী ধরে নাড়ীও পেলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনতে হুকুম দিলেন। সামন্ত অবশ্য তাতে তেমন আপত্তি করলেন না, কিন্তু হাতের বেড়ি খুলতে দিলেন না।

ডাক্তার রোগী দেখেই নাক সিঁটকোলেন। পরীক্ষা করে বললেন, অনেকক্ষণ এর মৃত্যু হয়েছে। আপনারা এতক্ষণ করছিলেন কি? বোধ হচ্ছে আফিং খেয়েছে। পোস্টমর্টেমেই বুঝতে পারবেন।

শুনে সামন্ত দারোগা পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইলেন। এ মামলায় আর কোনো উৎসাহ তাঁর রইল না। রণচণ্ডী গেলে এ মামলার আর থাকে কি?

এর পরের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপেই বলা চলে। অল্পদিনের মধ্যেই বাকি যে ক'জন ডাকাত ছিল তারাও ধরা পড়ল। প্রায় ছ'মাস মামলা চলার পর সব ক'জন নানারকম দণ্ডে দণ্ডিত হল। রায়ে হাকিম সামন্ত দারোগার কাজের যথেষ্ট প্রশংসাও করেছিলেন। কিন্তু রণচণ্ডীর মৃত্যুর পরে তাঁর কি যে হয়েছিল, মামলা চলবার সময় একদিনও কেউ তাঁর মুখে হাসি দেখতে পায়নি। তাঁর কাজকর্ম দেখলে মনে হত যেন একটা যন্ত্র চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, মামলা শেষ হবার পরই দারোগা একটা লম্বা ছুটি নিলেন। তারপরে আর তিনি কাজে যোগ দিলেন না, কর্মকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই অবসর নিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির বলেন—'তর্কের মীমাংসা নেই, বেদ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, বহু মুনির বহু মত, ধর্মের তত্ত্বও গভীর ও অজ্ঞাত, অতএব মহাজন যে পথে চলেন সেই পথই পথ।'



গল্প



নূতন সৌধ

সুব্রত এবং মহব্বৎ একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়ে।

বয়স তাদের চৌদ্দ-পোনেরো।

দু'জনে ভারি ভাব। তার কারণ আছে:

ওরা শুধু যে একই পাড়ার সামনা-সামনি থাকে তাই নয়, দুই পরিবারের মধ্যেও আত্মীয়তা আছে।

সুব্রতর বাবা রোহিণীকান্ত এবং মহব্বতের বাবা মেনহাজউদ্দিন কলেজে একসঙ্গে পড়তেন এবং একই বৎসর মুন্সেফী চাকুরী পান। সুদীর্ঘ চাকুরীকালে পরস্পরের মধ্যে দেখা শোনার সুযোগ কম ঘটলেও ছাত্রজীবনের বন্ধুত্ব হৃদয় থেকে সহজে যায় না। এই সত্যটি প্রমাণিত হয় ওদের চাকুরী পাওয়ার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, যখন উভয়েরই অবসর নেবার আর দেরী নেই।

সেই সময় আসাম মেলের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় হঠাৎ দু'জনের দেখা হয়ে গেল।

রোহিণীকান্তর মাথায় তখন প্রকাণ্ড চকচকে টাক, আর মেনহাজউদ্দিনের দাড়ি কাশফুলের মত ধপধপ করছে।

চেনা কঠিন, কিন্তু কারও চিনতে বিশেষ বিলম্ব হল না। মুহূর্ত মধ্যে দুইবন্ধু পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কী আশ্চর্য, দু'জনেই দু'জনকে প্রায়

ভুলে গেছলেন। জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় আবার দু'জনে দেখা। এ কী বিধাতার খেলা!

খেলাই বটে!

সারাটা জীবন মফঃস্বলের শহরে-শহরে ঘুরে দু'জনেই শেষ ক'টাদিন কাটাবার জন্যে স্থান খুঁজছিলেন। চাকুরীর মেয়াদ তো আর বেশি নেই!

স্থান পাওয়া গেল। যেমন স্থান খুঁজছিলেন, ঠিক তেমনি স্থানই। কলকাতা শহরের কোলাহল থেকে দূরে, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে, সামনা-সামনি দুটি প্লট পাওয়া গেল।

সেই যাত্রাতেই দু'জনে জায়গা দুটো কিনে ফেললেন। এবং জীবনের বাকী ক'টাদিন দুইবন্ধুতে আবার সহজ প্রতিবেশিত্বে ফিরে আসতে পারবেন ভেবে উল্লসিত হয়ে নিজের নিজের চাকুরীর জায়গায় ফিরে গেলেন।

যুদ্ধ তখনও বাধেনি। জিনিসপত্র সস্তা এবং সহজেই তখন পাওয়া যেতো।

সুতরাং দেখতে দেখতে সামনা-সামনি দু'খানা বাড়ী উঠে গেল।

সুন্দর ছোট ছোট দু'খানা বাড়ী। অবিকল এক রকমের।

যেন দুই যমজ ভাই পরস্পরের দিকে গভীর স্নেহে চেয়ে আছে।

তারপর দু'জনে অবসর নিলেন, এবং সেই দুটি বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন।

সুব্রত এবং মহব্বৎ তখন ছোট্ট।

তারা দু'জনে একসঙ্গে খেলা করে, ঝগড়া করে এবং ভাব করে। একসঙ্গে স্কুলে যায়, টিফিনে পরস্পরের খাবার ভাগ করে খায় এবং স্কুলের শেষে একসঙ্গে বাড়ী ফেরে।

যত দিন যায় উভয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা ততই ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। সুব্রতর মায়ের সঙ্গে মহব্বতের মায়ের সখিত্ব গড়ে উঠলো। কর্তারা ঘুমুলে দুপুরে ওরা কোনোদিন ও বাড়ীতে কোনোদিন এ বাড়ীতে মিলিত হয়। সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করে।

আর সরকারী চাকুরীর জোয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে কর্তাদের তো অবারিত অবসর। সময় কাটানোই দায়! ভোরে দু'জনেই একসঙ্গে পাশের পার্কে

বেড়ান, ফিরে এসে চা খেয়ে দু'জনেই একসঙ্গে বাজার যান। তারপরে খবরের কাগজ পাঠ। দুপুরে দিবানিদ্রা। বিকেলে চা-পান এবং দাবা খেলা।

দেখতে দেখতে উভয় পরিবার ভুলেই গেল তাদের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য।

মনে থাকবে কি করে?

দুর্ভিক্ষ কি সম্প্রদায়ের বিচার করেছে? না, সম্প্রদায়ের বিচার করেছে মহামারী?

কালো বাজারে হিন্দুরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি হয়েছে মুসলমানেরা।

তারপরে জাপানী বোমারু···সে যে বেছে বেছে মুসলমানদের বাড়ীর উপরই বোমা ফেলবে, এমন ভরসা কোনো হিন্দুর মনেই জাগেনি।

সুখে-দুঃখে দু'জনেরই একই দশা। জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতায় পেনশনের টাকায় দু'জনেরই কুলুচ্ছে না। দুই বৃদ্ধে বসে সেই গল্পই করেন।

যুগের হাওয়া ওদের শিশু-মনকেও স্পর্শ করে।

মাঝে মাঝে এই নিয়ে দুই ছোট বন্ধুর মধ্যে তর্কও হয়:

—জানিস ভাই, তোরা আর আমরা এক নই।—মহব্বৎ বলে।

—তবে কি?—সবিস্ময়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

—আমরা আলাদা নেশ্যন।

—সে কেমন করে হবে?

—তা জানিনে, চল্ স্কুলে যাই।

ওরা সব কথা ঠিক বোঝে না। কিন্তু টিফিনে একই সঙ্গে খাবার খেতে খেতে দু'জনেই অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, কী যেন একটা প্রকাণ্ড দুষ্ট শক্তি ওদের দুই ভায়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সেই শক্তি ওদের দুই ভাইকে বুঝি একসঙ্গে থাকতে দেবে না।

ওদের চোখে দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে আসে। অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন ভারী হয়ে ওঠে।

কারা এরা?

কারা এরা···যারা ভায়ের থেকে ভাইকে নেয় ছিনিয়ে? রাজনীতির দাবী কি হৃদয়ের দাবীর চেয়েও বেশি?

ওরা ভাবে নিজের মনে মনে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে স্পষ্ট বলতে পারে না।

তার ফলে ওদের মনের মধ্যে সোনার শিকলের যে সংযোগ তা যেন ঢিলে হয়ে আসে।

পরস্পরের কাছ থেকে ওরা যেন ক্রমেই দূরে সরে আসছে।

এখনও দু'জনে ওরা একসঙ্গে স্কুলে যায়, একসঙ্গে খাবার খায়, একই সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরে। কিন্তু দু'জনের হৃদয়ের সেই নিবিড়তা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে।

ওরা তা বুঝতে পারে। বুঝে মনে মনে কষ্ট পায়। কিন্তু প্রতিকারে কি যে করবে ঠাহর পায় না।

আর শুধু কি ওরাই?

রোহিণীকান্ত এবং মেনহাজউদ্দিনের মধ্যেও সেই অবস্থা।

পরিবর্তন ঘটেনি শুধু মেয়েদের মধ্যে।

বাংলার মেয়েদের, বাঙালী মেয়েদের ভগবান যে কি ধাতুতে গড়েছেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। তারা বোধহয় হৃদয় দিয়ে শোনে, হৃদয় দিয়েই কাজ করে।

বাইরের জগতে এত বড় একটা আলোড়ন যে বয়ে চলেছে, তার কিছুই উভয় পরিবারের গৃহিণীদের স্পর্শ ই করলো না। তাঁদের কাজ আগের মতোই চলতে লাগলো—সেলাই এবং গল্প।

সেদিন স্কুল যাবার সময় সুব্রত মহব্বৎকে ডাকতে গিয়ে মহব্বতের মাকে বললে:

—কাকীমা, মায়ের খুব জ্বর। আপনি দুপুরে একবার যাবেন।

মহব্বতের মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন:

—তাই নাকি রে? তাই সকাল থেকে তোর মাকে একটিবারও বারান্দায় দেখতে পাইনি। কখন থেকে জ্বর?

—কাল রাত্রি থেকে!

—জ্বর কি খুব বেশি?

সুব্রত ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

তারপরে দু'জনে স্কুলে চলে গেল নিত্য দিনের মতো।

মহব্বতের মাও সংসারের কাজকর্ম সেরে দুপুরবেলা দেখতে গেলেন সুব্রতর মাকে।

বৃদ্ধ রোহিণীকান্ত বসেছিলেন রোগিণীর পাশে। মহব্বতের মাকে দেখে তিনি নীচে নেমে গেলেন বসবার ঘরে।

জ্বর খুবই বেশী, ১০৪-এর কম নয়। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মহব্বতের মা ওর উত্তপ্ত ললাটে ওডিকলোনের পটি দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগলেন।

—একটু আরাম পাচ্ছ দিদি?—মহব্বতের মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিচ্ছু না দিদি, এতটুকু না। বরং আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, এ যাত্রা আমি আর বাঁচবো না।

—পাগলের মতো বোকো না। কী হয়েছে তোমার! কাল তো মোটে জ্বর হয়েছে। তাও এমন কিছু বেশি নয়।

—কি জানি দিদি, বেশি কি কম। কিন্তু আমার মন যেন কি রকম করছে। সুব্রত রইলো। ওকে তোমার মহব্বতের মতোই মহব্বতের পাশাপাশি মানুষ কোরো।

সুব্রতর মায়ের কথা শেষ হ'ল না। নীচে বহু-কণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনির মধ্যে বাকী অংশটুকু ডুবে গেল।

তারপরে পোনেরো মিনিট ধরে যে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটলো, তা চোখে দেখা যায় না,—দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। পোনেরো মিনিট পরে যখন বাড়ী স্তব্ধ হ'ল, তখন বাড়ীর জিনিসপত্র কতক লুট হয়ে গেছে, কতক ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে এবং দাউ দাউ করে বাড়ী জ্বলছে।

আর,—

বাড়ীর একটি প্রাণীও জীবিত নেই,—মহব্বতের জননীও না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাশের হিন্দু-পল্লীতে এই দুঃসংবাদ পৌঁছে গেল।

এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই আর একটা হল্লা হোল। এবার আর 'আল্লা হো আকবর' নয়, 'বন্দেমাতরম্'।

দেখতে দেখতে মেনহাজউদ্দিনের বাড়ীতেও ঠিক অনুরূপ কাণ্ড ঘটে গেল এবং সে বিষয়ে সাক্ষী দেবার জন্য একজনও জীবিত রইলো না। বাড়ী দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। এবং যারা এই কাণ্ডের নায়ক, তারা পনেরো মিনিটের মধ্যে ভোজবাজির মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

জ্বলছে দুটো বাড়ী।

যমজ ভায়ের মতো যে দুটো বাড়ী দীর্ঘ দশবৎসর পরস্পরের দিকে সস্নেহ-দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ তাদের মাথায় জ্বলছে আগুন।

সে আগুন উঠছে আকাশের দিকে, ভগবানের দরবারে।

দমকল এসে নেভালে সে আগুন।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল।

দুটি ভাই মহব্বৎ আর সুব্রত সেই ভস্মস্তূপের সামনে এসে অবাক হয়ে গেল।

এ কী তাদের বাড়ীর রূপ!

দরজা-জানালা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! কড়ি-বরগা ঝুলছে! জানালার লোহার শিকগুলো বেঁকে তুবড়ে গেছে। দুধের মতো ধপধপে দেওয়ালে আগুনের কালো কলঙ্ক-চিহ্ন।

এ কী রূপ!

কে এমন করলে!

সুব্রত চেয়ে দেখলে, কালো কাঠ-কয়লা দিয়ে কে লিখে রেখে গেছে: হিন্দুস্থানের এই দশা হবে।

মহব্বৎ চেয়ে দেখলে, তাদের বাড়ীর দেওয়ালেও ঠিক অমনি ক'রে কে লিখে রেখে গেছে: পাকিস্থানের এমনি দশা হবে।

অসহায়ভাবে ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। কারও মুখ থেকে একটি কথাও বার হোল না,—না শোকের, না ক্রোধের।

হঠাৎ দেখলে, একটি বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে তাদের দিকে আসছে।

পরণে তার ছেঁড়া কাপড়। দেহের হাড় বেরুনো। ক্ষুধায় পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে। গায়ের রং পোড়া কাঠের মতো। মাথায় শণের নুড়ির মতো এক মুঠো পাকা চুল।

শুধু চোখে জ্বলছে আগুন।

বুড়ি কাছে এসে ওদের দিকে চাইলে।

সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি তোমার বাড়ী?

বুড়িকে দেখে ওদের ভয় করছিল।

সুব্রত ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ।

—আর এইটি বুঝি তোমার বাড়ী?

—হ্যাঁ। মহব্বৎ জবাব দেয়।

—আহা! একেবারে ছাই হয়ে গেছে! বেঁচেও কেউ নিশ্চয় নেই। তোমাদের বাপ-মা সবাইকে তারা নিশ্চয় কেটে ফেলেছে!

—কারা কেটে ফেলেছে?

—সেই তারা। চেনো না তাদের? চিনবে দু'দিন পরে, তখন চোখ খুলবে। তখন বুঝবে কে আপন, কে পর। পালাও, পালাও—এখন পালাও, যেদিকে দু'চোখ যায়। হাঁ, যাবার আগে এই ছাই ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যাও: তোমরা দুই ভাই, শক্তিমান বাহু দিয়ে এই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার তোমরা নতুন সৌধ গড়ে তুলবে,—সে সৌধ হিন্দুস্থানেরও নয়, পাকিস্থানেরও নয়,—মানবস্থানের।

বুড়ি ঠুক ঠুক করে পাশের গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।



পরীদের মহাযুদ্ধ

জলপরীদের সঙ্গে স্থলপরীদের একদিন লেগে গেল যুদ্ধ।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। জলপরীরা থাকে জলে, আর স্থলপরীরা ডাঙ্গায়। ওদের মধ্যে যুদ্ধ বাধার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। এতাবৎ কালের মধ্যে আর কোনোদিন বাধেওনি। হঠাৎ সেদিন বাধলো সব প্রথম বার।

কেন বলছি।

পরীদের দেখেছ কোনোদিন? দেখোনি? সাধারণ মানুষ ওদের দেখতে পায় না। দেখতে পান শুধু কবিরা। অনাদি কাল থেকে তাঁরাই শুধু দেখে এসেছেন পরীদের।

তাঁরা বলেন, জলপরীদের গায়ের রং রাংতার মতো চকচকে শাদা। গায়ে দেয় তারা নীল রঙের ওড়না। জলেই তারা থাকে। জলের তলায় যে সব প্রবাল দ্বীপ আছে, সেইখানে তাদের বাড়ীঘর।

আর স্থলপরীদের গায়ের রং পাকা ফসলের মতো সোনালি। তারা গায়ে

দের গোলাপী রংএর ওড়না। খুব উঁচু পাহাড়ের মাথায়, কিংবা যে জঙ্গলে কেউ ঢুকতে পারে না তেমনি জঙ্গলে তাদের বাড়ী। লতার দোল্‌নায় তারা ফুলে-ফুলে দোল খেয়ে বেড়ায়।

এখন জলপরীদের ছিল এক মাসী, আর স্থলপরীদের এক পিসি। এদের নিয়েই দুই পরীর দলে বাধলো প্রচণ্ড যুদ্ধ।

এই যে মাসী আর পিসি, এরা দুটোই সমান দজ্জাল আর ঝগড়াটে। মাসী দুটো খলসে মাছে-টানা রথে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক আর উত্তরসাগর থেকে দক্ষিণ সাগর পর্যন্ত দিনরাত্রি চষে বেড়ায়। তার কাজও নেই, অবসরও নেই।

আর পিসির রথ টানে লাল রঙের দুটো ফড়িংএ। সেই রথে চড়ে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত হাওয়া খেয়ে বেড়ায়।

একদিন পিসি রথে চড়ে হাঁওয়াই দ্বীপে গিয়ে হাজির। চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেশ লাগলো তার দ্বীপটি। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কোমল শরীরে এই রোদে এতখানি পথ এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সমুদ্রের ধারে একটা ঠাণ্ডা কুঞ্জবন দেখে রথ থামিয়ে ফড়িং দুটোকে বিশ্রাম নেবার জন্যে ছেড়ে দিয়ে একটা ফুলের উপর পিসি দেহ এলিয়ে দিলে।

বোধ করি একটু তন্দ্রাই আসছিল। হঠাৎ কার হাঁচিতে তার মিষ্টি ঘুমটুকু গেল ভেঙ্গে।

রেগে চোখ মেলে দেখে মাসী।

কিন্তু মাসীকে সে তো চেনে না। বললে, কে রে?

মাসীও কম যায় না। সেও আর এক পর্দা সুর চড়িয়ে বললে, তুই কে রে?

—আমি স্থলপরীদের পিসি।

—আমি জলপরীদের মাসী।

পিসি বললে, ও, তোরাই বুঝি জলপরী? এমন হতকুচ্ছিৎ দেখতে? তোরা নীল রঙের ওড়না পরিস কেন?

মাসী জবাব দিলে, মাগো, স্থলপরীদের চেহারা এমন কদাকার। তোরা লাল রঙের ওড়না পরিস কেন?

লেগে গেল দু'জনে ঝগড়া।

এও যত চ্যাচায়, ওও তত চ্যাচায়।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ওরা যতই চ্যাচাক, মানুষে তা শুনতে পাবে না। মানুষের কানে যত শব্দ শোনা যায়, তার চেয়ে নিচু স্বরও সে শুনতে পায় না, উঁচু স্বরও শুনতে পায় না। পরীদের কথা পরীরাই শোনে, আর পরীরাই বোঝে। যেমন পিঁপড়ের কথা পিঁপড়েতেই শোনে আর বোঝে।

এমনি করে দুই দজ্জাল বুড়ীতে ঝগড়া চললো অনেকক্ষণ। শেষে যখন মুখে কুলোলো না, তখন হাত চলতে আরম্ভ করলো। মাসী পিসির কান ধরে এমন টান দিলে যে, কানে ঘাস ফুলের ঝুমকো গেল ছিঁড়ে। বিনিময়ে পিসিও মাসীর ঘাড়ে এমন এক রদ্দা দিলে যে, গলার পদ্মফুলের মালা দূরে ছিটকে পড়লো।

হাঁফাতে হাঁফাতে মাসী বললে, তুই আমার মালা ছিঁড়ে দিলি?

পিসি বললে, তুই আমার ঝুমকো ছিঁড়ে দিলি?

মাসী বললে, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!

পিসিও বললে, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!

মাসী তার খল্‌সে মাছের রথে চড়ে ছুটলো বোনঝিদের কাছে।

পিসিও তার ফড়িঙের রথে চড়ে ছুটলো ভাইঝিদের কাছে।

জলপরীরা মাসীর চেহারা দেখে অবাক!

বললে, মাসী, মাসী, কি হয়েছে তোমার?

মাসী এক ঘণ্টা ধরে শুধু কাঁদলে। একবার এ ঢেউতে আছড়ে পড়ে, একবার ও ঢেউতে।

অবশেষে বললে, স্থলপরীরা আমাকে অপমান করেছে।

—ছোটলোকদের এত বড় আস্পর্ধা!

রাগে জলপরীরা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

—চলো, দেখিয়ে দেবে কোথায় সে বেটিরা। তাদের নখে টিপে উকুনের মতো মারবো।

চলো! চলো! চলো!

তিন হাজার জলপরী কোমরে কাপড় বেঁধে শাঁখ বাজাতে বাজাতে যুদ্ধ করতে ছুটলো।

ওদিকে পিসিও গিয়ে ভাইঝিদের কাছে কেঁদে পড়লো।

—কি?

না, জলপরীরা অপমান করেছে।

এত বড় কথা! ছোট জাতের মুখে আগুন!

চার হাজার স্থলপরী এক একটা ঘাসের পাতা হাতে নিয়ে ছুটলো জলপরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্রতীরে দুই দলে জমায়েৎ হল!

এবং যুদ্ধ লেগে গেল।

একমাস ধরে যুদ্ধ চললো। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই।

ওরা ওদিক থেকে ঘাসের পাতার তরোয়াল ঘোরায়। এরা এদিক থেকে জলের বুদ্বুদ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। কোনো পক্ষেই কেউ হতও হয় না, আহতও হয় না।

মাঝ দরিয়া থেকে হাঙর, তিমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখতে লাগলো। তাদের খবরের কাগজে তারা রিপোর্ট পাঠাতে লাগলো এই লোমহর্ষণ যুদ্ধের।

শাদা ভালুক, হিপোপোটেমাস, অষ্ট্রিচ, কাঙ্গারু, জিরাফ, জেব্রা আরও কত রিপোর্টার যে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তার সীমা-সংখ্যা নেই।

যুদ্ধ চলেছে তো চলেইছে!

সাতাশ, আটাশ, ঊনত্রিশ দিন কেটে গেল, তবু যুদ্ধ থামে না।

ত্রিশ দিনের দিন একটি পরিপুষ্ট, প্রবীণ রামছাগল দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর কাশফুলের মতো শাদা ধবধবে দাড়ি মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে কিবা চেহারা!

যেন পশুজগতের মুনিঋষি!

দুই দলেরই পরীরা ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তাঁকে প্রণাম করলে। করযোড়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি আদেশ প্রভু?

প্রভু খুরসমেত ডান পাখানি উঁচু করে আদেশ দিলেন, সম্বর!

জলপরীরা বুদ্বুদ ছোঁড়া বন্ধ করলে। স্থলপরীরাও ঘাসের তলোয়ার কোষবদ্ধ করলে।

কিন্তু—

জলপরীরা বললে, আমাদের মাসীকে—

স্থলপরীরা বললে, আমাদের পিসিকে—

রামছাগল গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, তার বিচার আমি করছি, অবিশ্তি যদি তোমাদের মনঃপূত হয়!

—বিলক্ষণ! সে কি একটা কথা হোল! আপনার বিচার আবার মনঃপূত হবে না?

উভয় বাহিনীর মধ্যে কলরব পড়ে গেল!

রামছাগল বললেন, কিন্তু এই সাত হাজার লোক নিয়ে তো আর মীমাংসা হয় না। আমি বলি কি, এক এক দল থেকে পাঁচজন মাত্র থাকো। আর থাকুক মাসী আর পিসি। বাকি সব যে যার বাড়ী চলে যাও।

সকলে বিনা প্রতিবাদে এই আদেশ পালন করলে।

একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর রামছাগল খুব ভারিক্কি চালে বসলেন।

বিচার আরম্ভ হল।

রামছাগল জিজ্ঞাসা করলেন, এইবার বলো কি জন্যে তোমাদের এই ভীষণ যুদ্ধ।

একটি জলপরী বললে, আমাদের মাসীকে……

বাধা দিয়ে স্থলপরী বললে, ওদের মাসীকে নয়, আমাদের পিসিকে…

তারপরে আরম্ভ হয়ে গেল একটা প্রচণ্ড কলরব: এরা বলে আমাদের মাসীকে, ওরা বলে আমাদের পিসিকে।

আধ ঘণ্টা এই কলরব চলতে রামছাগল বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিলেন, চুপ কর, চুপ কর। আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও।

সবাই চুপ করলে।

রামছাগল বোকা হলে কি হয়, বুদ্ধিও আছে খানিকটা। চারিদিকের হট্টগোলে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ কি, না বুঝলেও কিছুক্ষণের মধ্যে এইটুকু বুঝলে যে, এ সবের মূল হচ্ছে ওই মাসী আর পিসি।

মাসী-পিসির উপর তার আগে থাকতেই রাগ ছিল।

যখন সে লোকালয়ে সংসার আশ্রমে বাস করতো, তখন তার নিজের বাড়ীতে ছিল এক মাসী, আর পাশের চাটুয্যে বাড়ীতে ছিল এক পিসি। দিনরাত্রি দু'জনের গলা ভাঙা কাঁসরের মতো বাজতো। বেচারা রামছাগলের, এই মাসী-পিসির মধ্যে পড়ে, আহার নিদ্রায় শান্তি ছিল না। বস্তুতঃ এদেরই অত্যাচারে একদিন সে সংসার ত্যাগ করে।

হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্রতীরে কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে আকাশে

মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, হায় ভগবান! এখানেও সেই মাসী-পিসি!

বললে, দেখ বাপুসকল, শান্তি যদি চাও তাহ'লে ওই মাসী-পিসিকে ছাড়তে হবে। ওদের কাজও নেই, অবসরও নেই। তাই খালি ঝগড়া বাধিয়ে বেড়ায়। আমার আদেশ হল, ওদের দু'জনকে এই দ্বীপে থাকতে হবে। তোমরা নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে যাও।

ঋষিবাক্য অবহেলা করা চলে না।

মাসী-পিসি রইল সেই দ্বীপে। ওরা চলে গেল নিজের নিজের রাজ্যে।

জলপরী আর স্থলপরীদের মধ্যে সেই থেকে আর একদিনও যুদ্ধ হয়নি।

কিন্তু হাওয়াই দ্বীপে মাসী আর পিসির মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ আজও চলছে। বোধ করি অনন্তকাল চলবে।



নতুন দিনের আলো

বসন্তবাবু সকাল দশটায় অফিস গেলেন, যেমন প্রতিদিন যান কিন্তু সেদিন বিকেলে আর ফিরলেন না।

কমলা নির্দিষ্ট সময়ে খাবার তৈরি করলেন। স্বামীর ফেরার সময়টি যেন তাঁর মুখস্থ। তরকারিটা নামিয়ে তিনি লুচি বেলতে বসেন, আর সেই সময় দরজার কড়াটা খট খট শব্দে নড়ে ওঠে। স্বামীর কড়া-নাড়ার বিশেষ ভঙ্গিটি তাঁর পরিচিত হয়ে গেছে। একবার নাড়তেই ছুটে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দেন।

তারপর বসন্তবাবু হাত মুখ ধুয়ে অফিসের পোশাক ছেড়ে খাবার খেতে বসেন। গত পনরো বছর ধরে ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁতভাবে এই ঘটনা ঘটে আসছে।

ব্যতিক্রম হল শুধু সেদিন।

কমলার লুচি বেলা হয়ে গেল, তবু কড়া সেই পরিচিত শব্দে নড়ে উঠলো না।

হয়তো অফিসের কাজ বেড়েছে।

বসন্ত ঠাণ্ডা লুচি খেতে পারেন না। যা আটা, এ তো ঠাণ্ডা হলে চামড়ার মতো হয়ে যায়।

কমলা বেলা লুচি ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে রাত্রের

রান্না চড়ালেন। কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না মোটে। সুতরাং উনুন কামাই দেওয়া তো চলে না।

কিন্তু কড়া আর কিছুতেই বাজে না। অশোক ফিরে এলো পার্ক থেকে।

—বাবা এখনো ফেরেননি মা?

—না তো। ভাবছি, কি যে হোল।

মা এবং ছেলের মুখে ভয়াবহ উদ্বেগের ছায়া নেমে এল। কি যে হোল, কি যে হতে পারে দু'জনের কেউই সেকথা ভাবতেও সাহস পায় না। দু'জনেই দু'জনকে সান্ত্বনা দিতে চায়।

—বোধহয় তাঁর কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছেন।

—তাই হবে। কমলা রাঁধতে বসলেন; কিন্তু মন বসে না।

অশোক পড়তে বসলো; কিন্তু পড়ায় মন বসে না।

মায়ে ছেলেয় লুকোচুরি চলছে। কেউ তার মনের উদ্বেগ অন্যকে জানতে দিতে চায় না,—পাছে অন্যের উদ্বেগ বাড়ে। অথচ দু'জনেরই মনে উদ্বেগের সীমা নেই।

সাতটার সময় অশোক আর থাকতে পারলে না আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল।

—হরিশবাবুদের বাড়ি থেকে একবার খবর নিয়ে আসব মা?

হরিশবাবুদের বাড়িটা এই গলির মোড়ের মাথায়। সেইখানে সন্ধ্যায় বরাবর ব্রিজ খেলার আসর বসে এসেছে। কারফিউ-এর উৎপাতে ক'দিন বন্ধ আছে। সুতরাং সেখানে বসন্তবাবুকে পাওয়ার যে সম্ভাবনা নেই মাতা-পুত্র উভয়েই তা বোঝেন। তবু কিছু একটা করা দরকার। আর কিছুক্ষণ পরেই 'কারফিউ' পড়বে। যা করার তার আগেই করতে হবে।

কমলা বললেন, তাই দেখ বাবা। এত দেরি তো কখনও তিনি করেন না।

হরিশবাবুদের বাড়ি অশোক খবর নিতে যেতেই সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দুশ্চিন্তা জমলো সকলেরই মনে। তখনই সবাই চললেন থানায়।

থানায় ডায়েরি লেখানো হলো, বিভিন্ন থানায় এবং হাসপাতালে টেলিফোন করা হলো। তা ছাড়া আর যেখানে যেখানে বসন্তবাবুর যাওয়ার

বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল তার কোনোখানেই টেলিফোন করতে বাকি রইলো না।

সে রাত্রি অশোকদের যে কী করে কাটলো তা আর বলবার নয়। কান্নায় দু'জনেরই বুক ফুলে ফুলে ওঠে, তবু একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতেও সাহস করে না। মনের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে, তার ঘরের ভিতর সারা রাত্রি আলো জ্বালা রইলো।

সারা রাত্রি দু'জনে জেগে রইলো। যদি কোথাও থেকে বসন্তর কোনো খবর আসে।

কিন্তু কোনো খবরই এলো না।

সে রাত্রি না, তার পরের দিনও না,—আর কোনোদিনই বসন্তর কোনো খবর আসবে না।

এরই কয়েকদিন পরে। ১৫ই আগাস্ট। সেদিনের সঙ্গে এ দিনের কি তফাৎ!

সেদিন পাড়ার সমস্ত বাড়ির আলো ছিল নেভানো, অশোকদের বাড়ির আলো ছিল জ্বালা। আজ সব বাড়িতে, চারিদিকে, জ্বলছে যখন হাজার হাজার আলো,—এই বাড়িটি অন্ধকার।

অন্ধকার, একেবারে কোণের ঘরে, ছেলেকে বুকে চেপে মা রয়েছেন বসে। দু'জনের কান্নায় দু'জনের অঙ্গ যাচ্ছে ভেসে। কারও মুখে কথা নেই। রাত্রির অন্ধকারে ভরানদী যেমন নিঃশব্দে বয়ে চলে—তেমনি।

—মা, আমার মা-লক্ষ্মী কই গো!

নিচে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দু'জনেই ধড়মড় করে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

কোনো রকমে হাঁতড়ে হাঁতড়ে দোতলায় উঠে এলেন গুরুদেব।

আজকের দিনে আলো জ্বলেনি যে মা?

দু'জনে নিঃশব্দে প্রণাম করলেন তাঁকে।

—স্বাধীনতা দিবস দেখতে বেরিয়েছিলেন বুঝি? কমলা জিজ্ঞাসা করলেন।

—না মা। আমি সোজা তোমার এখানেই আসছি।

—মহাত্মাজীর সঙ্গে আজ আপনার শহর ঘোরবার কথা ছিল না?

গুরুদেব হেসে আশাককে বললেন, না ভাই, আজ আমার তোমারই কাছে থাকবার কথা। তাই তো ঠুক ঠুক ক'রে তোমার কাছে এলাম। সামনের ওই খোলা ছাদে গিয়ে বসি চলো।

বাইরের আনন্দোন্মত্ত জন-কোলাহল সমুদ্রগর্জনের মতো ভেসে আসছে।

চারিদিকে আলোর মালা।

লক্ষ লক্ষ জাতীয় পতাকা উড়ছে ছাদে ছাদে।

লক্ষ কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি উঠছে: জয় হিন্দ্! হিন্দু-মুসলমান এক হো! বন্দেমাতরম্!

গুরুদেব বলতে লাগলেন:

হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গেল মা। দেশ-জননীকেও ফিরে পেলাম। সারাদিন আজ শুধু ভেবেছি। কি মূল্যে কি পেলাম, তারই হিসাব-নিকাশ করেছি। তুমি তো জানো, বসন্ত আমার নিজের ছেলের চেয়েও প্রিয়। আলো প্রথমে আমিও জ্বালাইনি মা। তারপরে মনে হল, বসন্তের বিনিময়ে অশোককে যে পেলাম, সেও তো সামান্য নয়। সেই পুরোনো অশোকের কথা বলছি না মা, স্বাধীন দেশের স্বাধীন অশোক,—নতুন অশোক,—সে যে কী আজও আমরা তা বুঝতে পারছি না মা। তবু চেয়ে দেখ তোমার অশোকের চোখের দিকে। বলো, ওকি তোমার কালকের সেই অশোক?

কমলা অশোকের চোখের দিকে চেয়ে থমকে গেল। সত্যি, সে অশোক তো নয়। এর চোখে যে নতুন দিনের আলো!

গুরুদেব অশোকের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার আজকে ছুটি দাদুভাই। শুধু মহাভারতটা দিয়ে যাও। এইখানের প্রদীপের আলোয় আমরা মায়ে-ছেলেয় সারারাত জাগব। আমি পড়ব শান্তিপর্ব, আর তুমি শুনবে। কেমন মা?

বুকের ভিতর থেকে কেমন যেন একটা চাপ কমলার দেহের অণু-পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছিল। তিনি যেন কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না।

বললেন, তাই পড়ুন বাবা। তাই পড়ুন।

মহাভারতখানি নামিয়ে দিয়ে অশোক উঠে গেল। একটু পরেই এ বাড়ীর আলোগুলো একে একে সব জ্বলে উঠলো।



বাঘের প্রতিবেশী

আমি তখন ছোটনাগপুরের একটা বড় জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করতাম। সে অনেকদিনের কথা। এখন যেমন সেখানে এক সহর থেকে অন্য সহরে যাতায়াতের জন্য 'বাস' পাওয়া যায়, তখন সে সুবিধা ছিল না। সম্বলের মধ্যে তখন ছিল ই, আই, রেলওয়ের—গ্রাণ্ড কর্ড লাইন আর 'পুশ্‌পুশ্‌' গাড়ী এবং পাল্‌কী।

পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ী একটা অদ্ভুত যান; পাল্‌কী বলো পাল্‌কী, রিক্সা বলো রিক্সা। পালকীর মত তার 'বডিটা', রিক্সার মতো দুটো চাকা, কতকগুলো লোক সামনে টানে, কতকগুলো লোক পিছন থেকে ঠেলে। যারা টানে তারা ম্যালেরিয়া জীর্ণ দুর্বল লোক নয়। তারা ওখানকার আদিম অধিবাসী, ছিপছিপে লম্বা দেহ, যেন কষ্টিপাথরে খোদাই করা। মাথায় বড় বড় বাব্‌রি চুল। একদমে তারা দশ-বারো মাইল পথ ছুটে চলে। এক শহর থেকে

আর এক শহর পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ তারা এইভাবে দশ-বারো মাইল অন্তর চটিতে চটিতে লোক বদলে নিয়ে যায়।

ছোটনাগপুরের সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। বাঙলার সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই, সেখানে সমতল প্রান্তর নেই, দিগন্ত প্রসারিত উন্মুক্ত ধানক্ষেতও নেই। চারিদিকে চাহিলেই সেখানে চোখে পড়বে মেঘের মতো ধূসর পাহাড়ের পর পাহাড় আকাশে গিয়ে মিশেছে। আর যোজনব্যাপী ঘন বনের মধ্য দিয়ে চলেছে উঁচু নীচু ঢেউ-খেলান পথ। অনেক দূরে দূরে তার ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম। সে গ্রাম বাঙলার গ্রামের মতো বড় নয়, সুন্দর নয়, সমৃদ্ধও নয়, তা মাত্র কয়েকখানি অতি জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি মাত্র।

আর যে ঘন বনের কথা বললাম, তাও ট্রেনে চলতে রেল লাইনের দু'পাশে লতা-গুল্মে ঢাকা দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গল বাঙলা দেশে যা চোখে পড়ে, তার মত নয়। দূর থেকে সেই নীল বন ঘন দেখায় সত্যি, কিন্তু ভিতরে এলেই কতকগুলো গাছের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। তা জঙ্গল নয়, দুষ্প্রবেশ্য তো নয়ই। সেখানে কেবল বড় বড় শাল, আমলকি, পলাশ, মহুয়ার গাছ।

দেখবে শাল গাছে সাদা ফুল ফুটেছে। পলাশ মহুয়া লালে লাল, যেন বনে কে রঙের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেখবে তারই মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট পাথর-নুড়ি ডিঙিয়ে একটা বেতের মতো লিকলিকে নদী ছোট মেয়ের মতো হাসতে হাসতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। হয় তো দেখবে অসংখ্য টিয়া পাখী মহুয়ার মধু খেতে ন্যাড়া গাছ ছেয়ে ফেলেছে। সে এক অপূর্ব শোভা।

যদি রাত্রে কোনদিন সেদিকে যাও, দেখবে সেই অন্ধকার কালো বনের স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে। কাঠুরেরা কাটছে কাঠ, তারই ঠকাঠক শব্দ উঠছে। মাঝে মাঝে তারা হাঁক দিয়ে পরস্পরের সাড়া নিচ্ছে। সেই হাঁকে ঘুমন্ত বন থেকে থেকে শিউরে উঠছে।

কিন্তু সাড়া নিচ্ছে কেন জান?

বাঘের ভয়ে। ছোটনাগপুরের জঙ্গল বাঘে ভরা—যে সে বাঘ নয়, একেবারে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের রাজত্ব। সে বাঘ একটা মস্ত বড় বুনো মোষকেও পিঠে ফেলে নদী লাফ দিয়ে পার হতে পারে।

সুতরাং কাঠুরেদের সাহস এবং শক্তির কথাটা একবার ভাবো। সেই রাত্রে, অন্ধকার জঙ্গলে তারা পঁচিশ-ত্রিশজন একা-একা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে নির্ভয়ে কাঠ কাটছে। ওদের কত আত্মীয় যে ঐভাবে বাঘের পেটে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তেমনি ওদের যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে জানতে পারবে, ওরা কতগুলি করে বাঘ মেরেছে,—বন্দুক দিয়ে নয়, ওদের কোমরে যে অতিরিক্ত একখানা কুড়ুল থাকে তাই দিয়ে। সে শক্তি সাহস না থাকলে, কখনই ওরা বাঘের রাজত্বের মধ্যে বাস করতে সাহস করত না। ওদের কর্মঠ, শক্তিমান অথচ ছিপছিপে শরীরের নিখুঁত গড়নের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে, ওদের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের প্রতিবেশী হবার যোগ্যতা আছে।

জমিদারের কাজে আমাকে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হয় প্রায়ই। সে পথে ওরাই আমার সঙ্গী, আমার বাহক, আমার বন্ধু। ওদের সঙ্গে আমার খুব ভাব। আমাকেও ওরা খুব ভালবাসে। সত্যিকারের বন্ধুত্ব যদি করতে চাও, ওদের চেয়ে বড় বন্ধু তুমি পাবে না, খল-কপটতার চিহ্ন মাত্র নেই। তোমার একটা কথায় ওরা এক মুহূর্তে প্রাণ নিতেও পারে দিতেও পারে। ওদের ডাকাত বল ডাকাত, সাধু বল সাধু,—কিন্তু ওরা ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে। জীবনের কুড়িটা বছর মিশে ওদের সম্বন্ধে এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলের পথে সন্ধ্যে হলে চটিতে আশ্রয় নেওয়াই ভালো। অন্নগত প্রাণ চাকুরীজীবী আমি অন্ততঃ তাই করতাম। সন্ধ্যার মুখে চটি কিম্বা ডাকবাংলো পেলে আমি সেইখানেই রাত্রি যাপন করতাম। চাল-ডাল-নুন-তেল আমার সঙ্গে থাকত, কিছু আলু বেগুনও। হয়তো সকলের জন্যে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতাম। নয়তো পাঁউরুটি আর জেলি।

আমার বন্ধুরা বেশী শীতে আগুন দিয়ে তার চারিদিকে সকলে মিলে চক্রাকারে বসত। তাদেরই কাছে হয়তো একটা ডেক-চেয়ারে, নয়তো একটা পায়া ভাঙ্গা খাটিয়ায় শুয়ে থাকতাম আমি। তারপর গল্প। ওদের বাড়ী-ঘরের গল্প, শিকারের গল্প, ভূত-প্রেত দেবদেবীর গল্প, ওদের জীবন-যাত্রার কত কি গল্প।

প্রথম প্রথম আমার সে সব অদ্ভুত লাগত, কতক বা বিশ্বাসও হত না। কিন্তু যতই ওদের চিনতে লাগলাম, ততই বুঝলাম, আমাদের গল্প

লিখিয়েদের মতো আগা গোড়া বানিয়ে বলা ওদের আদিম মনের পক্ষে অসম্ভব। ওরা সত্যবাদী, তার কারণ মিথ্যে বানিয়ে বলবার জন্যে যে কল্পনাশক্তির দরকার তা ওদের নেই। সেই কারণে ওদের কাছ থেকে যে সব গল্প শুনতাম, তার বেশীর ভাগই আগাগোড়া সত্যি। কোনো-কোনোটার মধ্যে যদি কিছু মিথ্যে থাকেও, তাও একেবারে মিথ্যে নয়। মোটামুটি একটা সত্যি গল্পের উপর কিছু পরিমাণ কল্পনার (মিথ্যের নয়) রং চড়ানো, কিন্তু রং চড়ানোর অভ্যাস না থাকায় তা খুব সহজেই ধরা পড়তো। এমন একদিন হয়েছে, গল্প যখন পুরোদমে চলেছে, ঠিক তখনই বাঘের ডাক শোনা গেল অত্যন্ত কাছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যেত প্রকাণ্ড বড় একটা বাঘ নবাবী চালে হেলে-দুলে চন্দ্রালোকিত মাঠের উপর দিয়ে চলেছে। কিম্বা হয়তো একপাল হুড়ার সমরাভিযানকারী সৈন্যদলের মত দ্রুতবেগে চলেছে।

এ জঙ্গলের অধিকাংশ বাঘই আমার বন্ধুদের পরিচিত। প্রত্যেক বাঘের তারা নামকরণ করেছে। চেহারা দেখে তো বলতে পারতই, ডাক শুনেই অনেক সময়ে বলে দিতে পারত, ওটা কালুয়া না ভালুয়া। বিশেষ করে পরিচিত ছিল একটা এক চক্ষু খতু ব্যাঘ্র। এর ডাকের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও তাকে চেনা সম্ভব হয়েছিল।

এই বাঘটির জীবনের ইতিহাসে রঙ্গির কুঠারের চিহ্ন ছিল।

রঙ্গি আমার বাহক বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের। ফুল তার অত্যন্ত প্রিয়। সব সময় তার কানে একটা সুন্দর ফুল গোঁজা। শত কাজের মধ্যেও কোথাও একটি সুন্দর ফুল দেখলেই সেটা তার চাই-ই।

যখন ওর বয়স ষোল কি সতেরো, সেই সময় ওই কানা বাঘটির হাতে ওর বাবার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি আরও একটু বড় করে বলি।

রঙ্গির বাবা কখনও পুশপুশ টানেনি। সে ছিল দুর্ধর্ষ গোছের লোক। পুশপুশ টানার মতো নিরীহ কাজে তার মন বসেনি। গভীর রাত্রে জঙ্গলে গিয়ে সে কাটতো কাঠ। পিছন থেকে আচমকা এসে বাঘ না আক্রমণ করতে পারে সেজন্য আর সকলের মতো সব সময় আগুন জালিয়ে রাখত। আর সকলের মত একখানা কুড়ুল দিয়ে সে কাঠ কাটত আর জরুরী অবস্থার জন্য আর একখানা সব সময় পিছন দিকে কোমরে গুঁজে রাখত। সেই

কুড়ুলে জঙ্গলের অনেক বাঘ সে মেরেছে। শক্তিশালী বলে তার খ্যাতি ছিল।

রঙ্গির বাবা এই কাজ করত। রাত্রে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটত, আর দিনের বেলায় শহরে গিয়ে তাই বিক্রি করে আসত। রঙ্গি তখন ছোট, বাড়ীতে যে ছাগল মোষ ছিল, তাই চরানো ছিল তার কাজ। আর বাঁশী বাজাতো, সকালে উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে মোষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে সে যেত মাঠে। কানে গোঁজা থাকতো ফুল। কখনও কখনও ছোট ভাইটিকেও নিজের কোলের কাছে নিয়ে মোষের পিঠে চড়ে বার হত। তাকেও তো মোষ চরানো শিখতে হবে। রঙ্গির ষোলো-সতেরো বয়স হল। কতকাল সে আর নাবালকের মতো মোষ চরাবে। এইবার তো তাকে বাপের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটতে হবে। সহরে গিয়ে তা বিক্রি করেও আসতে হবে। তার তো আর মোষ নিয়ে চিরকাল ছেলেমানুষের মতো পড়ে থাকলে চলবে না! সে তীর ধনুক নিয়ে কখনও খরগোস কখনও বা কোনো পাখী শিকার করত। বাড়ীর রান্নার জন্য ছোটো ছোটো শুকনো ডালপালাও বয়ে নিয়ে আসত। কিন্তু তখন তার বিয়ের কথা হচ্ছিল। সুতরাং ও সব নিরীহ নেশা ছেড়ে দিয়ে তাকে জঙ্গলে যেতে হবে। মাঝে মাঝে যেতও। কিন্তু পুরোপুরি সাবালক হবার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

একদিন সকালে তার বাপের সঙ্গের লোকেরা এসে খবর দিলে, তার বাপকে বাঘে নিয়ে গেছে। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। প্রতিবেশী মেয়ে পুরুষ সব কাজ ফেলে এল তার মাকে সান্ত্বনা দিতে।

ওদের মধ্যে এরকম ঘটনা বিরল নয়, আশ্চর্যেরও নয়। কিন্তু রঙ্গির বাবা ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বলবান ব্যক্তি। অনেক বাঘ সে কুড়ুলের আঘাতে মেরেছে। তার মতো লোককে হঠাৎ এসে বাঘে নিয়ে গেল, সে কিছু করতে পারলে না, এইটেই আশ্চর্যের।

কিন্তু রঙ্গির বাবার একটা ত্রুটি হয়েছিল, যা তার এতদিনের কাঠুরে জীবনের মধ্যে আর কখনও ঘটেনি। কাঠ কাটতে কাটতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একটা গাছ কেটে সে আর একটা গাছ কাটতে লাগলো। তারপর আর একটা। তার যেন কাঠ কাটার নেশা চেপে গিয়েছিল। কাঠ কেটে চলেছে তো চলেছেই। কাঠের স্তূপ করেছে। এখন কি করে বয়ে নিয়ে যাবে তা পর্যন্ত ভাবেনি।

ইতিমধ্যে নূতন কাঠের অভাবে তার পিছনের আগুন কখন গেছে নিভে। সেদিকে তার খেয়াল নেই। শুধু যে নিভেই গেছে তা নয়, কাঠ কাটার নেশায় সে নিজেও অনেকখানি সরে এসেছে, তাও বুঝতে পারেনি।

সুযোগের অপেক্ষায় বাঘ অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হয় ঘুরছিল। আগুন নিভে যেতে নতুন শিকারের লোভে তার নিশ্চয় জিভে জল এসে গিয়েছিল। তার উপর যখন রঙ্গির বাবা সেখান থেকেও খানিকটা দূরে সরে গেল, তখন সে লোভ সামলানো বাঘের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

পিছন থেকে আচম্বিতে এসে একটি থাবায় তার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে সে কোনো শব্দ করবার আগেই বাঘ তাকে মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুটো কুড়ুল কোনো কাজেই এল না। অবশ্য এই তাদের অনুমান, এ দৃশ্য কেউ চোখে দেখেনি। দেখলে এ দুর্ঘটনা ঘটবেই বা কেন?

ফিরে এসে রঙ্গি এই ঘটনা শুনলে। সে তখন মোষ চরাতে গিয়েছিল।

একটা কথাও সে বললে না। বাইরের দাওয়ায় তার শোকার্ত মা লুটিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। তার মেজ ভাই উঠানের এক পাশে কাঁদছে, তার সব ছোট বোনটি কিছুই বুঝতে না পেরে একটি আঙুল মুখে পুরে বিহ্বলের মতো কাঁদছে।

তাদের থেকে দূরে দাওয়ায় একপাশে রঙ্গি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ··· ···

তারপর যখন সে চোখ তুলে চাইলে তখন তার চোখ দুটো জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ। তার মধ্যে এক ফোঁটা জল নেই। রঙ্গি একটা কথাও কইলে না। নিঃশব্দে উঠে ঘরের ভিতর থেকে তার তীর ধনুক বার করলে, আর একটা কুড়ুল। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই সে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল জঙ্গলে, যেখানে তার বাপকে বাঘে নিয়ে গেছে। সেখানে শুধু তার মাথায় বাঁধবার ছোট ন্যাকড়াটা পাওয়া গেল। সেখান থেকে উন্মাদের মতো সমস্ত বনময় রঙ্গি ছুটে বেড়াতে লাগল। তার বাপকে সে খুঁজে বের করবে, বের করবে সে বাঘটাকে। তারপরে রয়েছে সে আর তার তীর ধনুক ও কুড়ুল।

তারই জন্য সমস্ত বন সে পাঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে লাগল। সে জানে কি রকম জায়গায় দিনের বেলায় বাঘ লুকিয়ে থাকে। পাহাড়ের গুহায়

ঘন সন্নিবিষ্ট শালগাছের অন্ধকার ছায়ায়, নদীর বাঁকে বাঁকে, সর্বত্র সে খুঁজতে লাগল। নদীর ভিজে বালুতীরে সে বাঘের পদচিহ্ন খুঁজে বেড়াতে লাগল। না খুঁজে সে জল গ্রহণ করবে না, বাড়ীও ফিরবে না, এই তার পণ।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হ'ল। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ন। গাছের ছায়া বড় থেকে ছোট হল, আবার ছোট থেকে বড়। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। —না বাঘের, না তার বাবার। সেই সকালে কি দুটি খেয়ে রঙ্গি বেরিয়েছিল এর মধ্যে সে এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করেনি। ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত কিছু যেন তাকে ত্যাগ করেছে।

পরশুরাম যেমন কুঠার হস্তে ক্ষত্রিয় নিধনে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণে বার হয়েছিলেন, রঙ্গি তেমন ব্যাঘ্র নিধনের জন্য সমস্ত বন দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুতে বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সূর্য অস্ত যাবার আর দেরী নাই। আমলকি গাছের আড়ালে দেখা যায় লাল সূর্য। তার ছায়া এসে পড়েছে নদীর জলে। রঙ্গি নদীর ধার দিয়ে উন্মত্তের মতো চলে। কখন দুপুর হল, কখন বিকেল এল—তার খেয়াল নেই। সন্ধ্যা যে হয়ে আসে, এখনই সূর্য অস্ত যাবে, বনে নামবে অন্ধকার—সেদিকেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

সে চলেছে, চলেছেই।

হঠাৎ এক সময় সে থমকে দাঁড়াল। নদীটা সেখানে পুবে বেঁকেছে তারই আড়ালে কয়েকটা আমলকি গাছের নীচে খস্ খস্ খুট খুট শব্দ হচ্ছে না?............রঙ্গি সচকিত হয়ে উঠল।

উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখে সত্যি। তার দিকে পিছন ফিরে একটা মস্ত বড় বাঘ একটা নরদেহের উপর থাবা দিয়ে বসে আছে।

বিদ্যুতের মতো তার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

চোখের পলকে সে তীর ধনুক উচিয়ে ধরলে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘটা এদিকে চাইতেই তীরটা একেবারে তার চোখে গিয়ে বিঁধল। হতচকিত বাঘ লাফিয়ে জলে পড়ল। এবং সেখান থেকে একটা আর্তনাদ করে ওদিকের জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিও সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল দেখলে তার গ্রামের লোকেরা তার চারিদিকে বসে জটলা করছে। তারাও সমস্ত দিন ওর সন্ধানে ঘুরেছে। বাঘের গর্জনে আকৃষ্ট হয়ে তারা এইখানে এসেছে। সেই থেকে বাঘটির এক চক্ষু অন্ধ। বোধ করি আচমকা নদীতে লাফ দিতে গিয়েই পা-টাও ভেঙ্গে যায়। এখনও সে সেই অবস্থাতেই আছে।

সে যাই হোক, তার মা আর তাকে কাঠ কাটতে যেতে দেয়নি। সে তাই তার পৈত্রিক কাঠুরের ব্যবসা ছেড়ে এখন পুশপুশ টানছে। কিন্তু বাঘের ডাক শুনলে এখনও তার চোখ জ্বলে উঠে।



গল্প বলার খেলা

যতীন ও রতীন দুই বন্ধু। তারা এক ক্লাসেই পড়ে। তাদের একটা খেলা আছে: গল্প বলার খেলা। নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর বসে একজন একটা গল্প শুরু করে, একটুখানি বলেই তার সূত্র অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়। এইভাবে পালা করে একটা গল্প তারা বানায়। সেদিনও তাই হচ্ছিল।

শুরু করলে রতীন। খেয়াঘাটের উপরে তারা দু'জনে বসেছিল। বসেছিল আর খেয়া পারাপার দেখছিল। তাই থেকে গল্পের সূত্রটা রতীনের মাথায় এল। রতীন শুরু করলে:

বৈশাখের বিকাল বেলা। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়েছে। আর একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে। দুটি ছেলেমেয়ে ব্যস্তভাবে এসে মাঝিকে বললে নদী পার করবার জন্য।

এক টুকরো কালো মেঘ অত্যন্ত দ্রুত বেগে আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল। গাছপালাগুলো স্তব্ধ। চারিদিকে থমথমে ভাব।

সেইদিকে তাকিয়ে মাঝি বললে, দেখছ না ঝড় আসছে। এখন আর পার করা চলবে না। ফিরে যাও।

ছেলেটি বললে, খুব চলবে। ঝড় আসতে এখনও অনেক দেরী। আমি বাড়ী ফিরতে চাই। নইলে মা-বাবা খুব ভাববে।

মাঝির সাহস নেই। সে ক্রমাগত আপত্তি জানাতে লাগল। চেনা মাঝি, চেনা দুটি ছেলেমেয়ে। মাঝি ছেলেমেয়ে দুটিকে মাসীর বাড়ী ফিরে যাবার জন্য বোঝাতে লাগল। কিন্তু ওদের মন মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সেই সকালে দুটি ভাই-বোন ওপারে মাসীর বাড়ী গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল সন্ধ্যায় ফিরবে। এমন তারা মাঝে মাঝেই যায় আসে, মাঝিও জানে সে কথা। ঝড় আসবে বলেই তারা ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছে। ঝড় আসবে বলেই মাঝির আপত্তি। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটির কান্নাকাটি ও কাতর অনুরোধে সে আপত্তি টিকল না।

মাঝি বললে, চল দিদিমণি। পাড়ি তো দিই। তারপর ঠাকুর যা করেন তাই হবে।

নৌকোর রশি মাঝি খুলে দিল।

এখানে রতীন চুপ করে থেমে গিয়ে, যতীনের মুখের দিকে চাইল।

যতীন শুরু করলে :

নদীর মাঝ বরাবর নৌকা তখনও আসেনি। এমন সময় ঝড় উঠল। কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

মাঝি চিৎকার করে উঠল। অন্ধকার আকাশ। তেমনি ঝড় আর মেঘের গর্জন। তার মধ্যে ছেলেমেয়ে দুটিও চিৎকার করে উঠল। ঝড়ের বেগে তীরের মত নৌকা ছুটল উজানে। মাঝি খুব ওস্তাদ। বলতে গেলে, ছেলেবেলা থেকে নৌকা চালিয়ে আসছে। কিন্তু এই ঝড়ের মুখে নৌকা সামলাবার ক্ষমতা কারো নেই। নৌকা ছুটছে তীরের বেগে। নদীর ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। কালো, কালো, আকাশ কালো, নদীর জল কালো, চারিদিক কালো যেন 'আলকাতরার মত। প্রাণের ভয়ে মাঝি ছেলেমেয়ে দুটোকে তিরস্কার করতে লাগল। নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল। ছোট ছেলেমেয়ের কথা শুনে কালবৈশাখীর ঝড়ের মুখে যে বেকুবের মত নৌকা ছেড়েছিল সে জন্য নিজেকেও ধিক্কার দিতে লাগল। সে চিৎকার ঝড়ের গর্জনে ছেলেমেয়েদের কানে হয়ত পৌঁচচ্ছিল না। তারা দু'জনেই মূর্ছা গিয়েছিল।

যতীন থেমে রতীনের দিকে চাইলে।

রতীন বলতে লাগল :

পরদিন সকাল।

তখন আর ঝড় নেই। কিন্তু ওপড়ানো গাছে, চারিদিকে ছড়ানো খড়-কুটোয় ভাঙ্গা মাটির ঘরে তার চিহ্ন রয়েছে।

কোতলপুরের জমিদারদের জমিদারী যত না বড়, তার চেয়ে বড় তাদের দাপট। এ অঞ্চলের যত লাঠিয়াল সমস্ত তাদের হাতে। জমিদারদের বড় আয় হচ্ছে ডাকাতি।

পাঁচশো বছর আগের কথা বলছি। তখন এখনকার মত গভরমেণ্ট ছিল না। জমিদারই ছিল গভরমেণ্ট; দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুতরাং নামে জমিদার হলেও কোতলপুরের মোহনবাবুকে সবাই রাজাবাবু বলে ডাকত।

রাজাবাবু তার লোকজনদের হুকুম দিলেন সমস্ত রাজ্য ঘুরে ঘুরে দেখতে কোথায় কার কি ক্ষতি হয়েছে। তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে বললেন।

হুকুম পেয়ে লোকজন হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল চারিদিকে। রাজাবাবুর বড় ছেলে কুমার, বছর ষোল তার বয়স, সেও বন্ধুদের নিয়ে বেরুল।

কুমার বেরিয়ে পড়ল নদীর দিকে। সেদিকটায় মাঝ নদীতে একটা চর পড়েছে সেইদিকে।

ঘুরতে ঘুরতে কুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দেখ দেখ চরের উপর কি যেন একটা শুয়ে না?

সবাই সবিস্ময়ে দেখলে, তাই বটে! মনে হচ্ছে যেন একটা ছোট মেয়ে।

রতীন থামল।

যতীন বলতে লাগল :

চরের নাম 'একশো বিঘার চর'। বছর কয়েক থেকে চাষবাসও চলছে।

চরের মেয়েটিকে দেখে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কে জানে মেয়েটি বেঁচে আছে না মারা গেছে। তাড়াতাড়ি একখানা নৌকা ডেকে ওরা চরে গিয়ে উঠল।

উঠেই থমকে গেল।

লাল শাড়ী পরা একটা মেয়েই বটে। জীবন্ত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ওরা থমকে গেল একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখে। বেলা বেশী না হলেও

এরি মধ্যে সূর্যের তেজ হয়েছে। বোধ করি সেই রোদ থেকে রক্ষা করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড বড় গোখরো সাপ মেয়েটির মুখের উপর ফণা ধরে আছে। এতবড় সাপ সহজে দেখা যায় না। ওরা ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাপটা তেড়ে এলে সেখান থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

সাপটা কিন্তু তেড়ে এল না। ওদের দিকে চিক্‌মিক করে চাইলে। চেরা জিভটা লিক লিক করে বারকয়েক বার করলে। তারপর সুড় সুড় করে চলে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

যতীন থামল।

রতীন বলতে লাগল :

সাপটা চলে যেতে কুমার এবং তার দলবল সাহস পেল। ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে এগিয়ে এল তারা। কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করার পর মনে হল মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসছে। আরো কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি চোখ খুললো। সামনে অনেকগুলি অপরিচিত ছেলেকে দেখে একটু সঙ্কুচিত হল। তারপর অশ্রুতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, আমি কোথায়?

কুমার বললে, তুমি কোতলপুরের চরে।

মেয়েটি কোতলপুরের চরের নাম শুনেছিল বলে মনে হল না। একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে, পারলে না।

কুমার তার একজনকে হুকুম দিলে, তুমি আমাদের বাড়ী চলে যাও। মাকে সব কথা বলে একটা পাল্কী নিয়ে এস। খুব জল্‌দি।

খুব তাড়াতাড়ি পাল্কী এল। মেয়েটিকে পাল্কীতে উঠিয়ে রাজাবাবুর বাড়ী নিয়ে আসা হল।

অনেক শুশ্রূষার পর বিকেলের দিকে মেয়েটি খানিকটা সুস্থ হল। কিন্তু বাপ মার জন্য খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর রাণীমা শুধু এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, ঝড়ে নৌকাডুবির ফলে এই কাণ্ড হয়েছে। মেয়েটির বাড়ী রসুলপুর। এইদিকের লোক সে গ্রামের নামও শোনেনি। তখন রেল ছিল না, ষ্টিমার ছিল না, ডাকঘর টেলিগ্রাফ কিছুই ছিল না। তখন বিশ ক্রোশ দূরত্ব এখনকার দুশো ক্রোশের থেকে বেশি ছিল।

ন-দশ বছরের ছোট মেয়ে নিজের গ্রাম ও মাসীর গ্রামের নামটাই শুধু জানে, তার বেশি আর কিছু জানে না।

রাণীমা তার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

মেয়েটি বললে—রাধা। বাপের নাম বললে রামকৃষ্ণ মুখুজ্যে।

রাজাবাবু মনে মনে ভাবলেন, তাদেরই স্বঘর। মেয়েটি পরমাসুন্দরী না হলেও কুৎসিৎ নয়। যে মেয়ের মাথায় সাপে ফণা ধরে সে মেয়েটি কুৎসিৎ হলেও তাকে তিনি পুত্রবধূ করতে আপত্তি করবেন না। লোকে তাকে রাজা বলে। কিন্তু তিনি জানেন সত্যি-সত্যি তিনি রাজা নন। শক্তিশালী জমিদার মাত্র। শক্তিটা গোলা-বারুদের নয়, লাঠি এবং তলোয়ারের। তাঁর মাথার উপর আছে বীরগঞ্জের রাজা। তার ওপর খাস নবাব বাহাদুর। অথচ তাঁর বহুদিনের সাধ তিনি রাজা হবেন। একেবারে স্বাধীন না হলেও কার্যতঃ স্বাধীন। রাধাকে পুত্রবধূ করতে পারলে সে সাধ পূর্ণ হতে পারে।

যতীন থামল।

যতীন বলতে লাগল :

রাজাবাবু চারিদিকে লোক পাঠালেন। খোঁজ কোথায় রসুলপুর? খুঁজে বের কর সেই গ্রামের রামকৃষ্ণ মুখুজ্যেকে। নিয়ে এস তাকে এখানে। বিবাহ উৎসবটা তিনি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান। দৈবের কথা বলা তো যায় না। লোক ছুটল নৌকায়। নৌকাডুবির থেকে মনে হয় রসুলপুর নদীর ধারেই কোন গ্রাম হবে। কিন্তু নৌকো থামতে থামতে চলে, সুতরাং নদীর ধারে ধারে ঘোড়সওয়ার ছুটে চলল।

রাধা অন্দরে বসে এই খবর শুনে মনে মনে খুশি হয়। তার বাবা মাকে আবার দেখতে পাবে। কিন্তু একের পর এক লোক ফিরে আসে, বলে, রসুলপুরের নাম কেউ শোনেনি।

রাজাবাবু রাধাকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ মা, গ্রামের নামটা রসুলপুর ঠিক তো?

রাধা ভড়কে যায়। তারও মনে সন্দেহ হয়। আমতা আমতা করে বলে, তাই বলেই তো সবাই ডাকে।

রাজাবাবু আরো দূরে ঘোড়সওয়ার ছোটালেন রসুলপুরের সন্ধানে।

তাঁর যেন আর তর সইছে না। রাধার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে দিতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব। রাধাকে তাঁর পুত্রবধূ হিসাবে চাই-ই। তার রাজলক্ষণ আছে। সেই হবে কোতলপুরের ভবিষ্যৎ মহারাণী।

কিন্তু মনের ইচ্ছা তিনি কাউকে মুখ ফুটে বললেন না। এমন কি রাণীকে পর্যন্ত নয়। অঘটন কখন কি ঘটে বলা তো যায় না।

রাধার বাপ-মায়ের খোঁজ নেওয়া চলতে লাগল। কিন্তু এই ব্যবস্থা করেই তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। কুমারের জন্য যেমন ঘোড়ায় চড়া শেখানো, লাঠি এবং তলোয়ার খেলা শেখানোর ওস্তাদ রেখেছেন, রাধার জন্যও সেই ব্যবস্থা করলেন। সমানে গুরুমশাই এসে তাকে লেখাপড়া শেখান, কিছু বাংলা ও কিছু ফার্সি। বিকালে ওস্তাদ এসে তাকে ঘোড়ায় চড়া এবং লাঠি ও তলোয়ার খেলা শেখান।

প্রথম প্রথম রাধা মহা বিব্রত হয়ে পড়ল। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। এ সবে তার কি দরকার? বড় হয়ে সে রাঁধবে বাড়বে, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-পুত্রের পাতে ভাত দেবে, এই তো তার কাজ। ঘোড়ায় চড়ে সে কি করবে?

কিন্তু রাজাবাবুর হুকুম। এ অঞ্চলে তাঁর কথায় প্রশ্ন করার রেওয়াজ নেই। তিনি যা বলেন সকলেই নিঃশব্দে নতশিরে মেনে নেয়।

রাধাকেও মেনে নিতে হল।

রতীন বলতে লাগল:

তখনকার দিনে গুপ্তচরের প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশী। নবাবের চর ঘুরত রাজা-মহারাজাদের পিছনে। আর রাজা-মহারাজাদের চর ঘুরত তাঁদের অধীনস্থ জমিদারের পেছনে। কে কখন কি করে, উপরওয়ালাকে অমান্য করে হঠাৎ স্বাধীন হয়ে বসে, কার মনের পিছনে কি মতলব ঘুরছে বলা তো যায় না।

রাজাবাবু একটি অপরিচিত মেয়েকে চর থেকে তুলে এনে যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছেন। কেন? কে এই মেয়েটি? হঠাৎ তার উপর রাজাবাবুর এই খেয়াল চাপল কেন? চরেরা এবার মাথা ঘামাতে বসল। এরা বাইরের লোক নয়। আজকাল রেল স্টেশনে বিজ্ঞাপন দেখা যায়: 'পকেট মার হইতে

সাবধান!' এরাও তেমনি সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছেই থাকে। হয়ত তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি।

রাজাবাবু এসব জানতেন, এবং এদের সম্বন্ধে সতর্কও ছিলেন। যদিচ কোথায় কার সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে তার কোন স্থিরতা ছিল না। কারণ অন্দর থেকে সদর পর্যন্ত সর্বত্রই এরা ছড়িয়ে ছিল।

তাই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও কিছু কিছু প্রকাশ হতে বাকী থাকে না। যেমন স্বাধীন রাজা হতে হলে গড় চাই। গোপনে গড় বাঁধা যায় না। সুতরাং রাজাবাবু যখন তাঁর রাজবাড়ীর চারপাশে গড় খুঁড়তে আরম্ভ করলেন তখন সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, 'হঠাৎ গড়খাই কেন?'

রাধাকে যখন পাওয়া গেল তখন কুমারের সঙ্গে তার বন্ধুরাও ছিল। সুতরাং রাধার মাথায় সাপের ফণা তোলার গল্পটা সহজেই ছড়িয়ে পড়েছিল। চরেদেরও তা জানতে বাকী ছিল না। তারা গড় তৈরী, সাপের ফণা ধরা এবং রাধার যুদ্ধবিদ্যা শেখার ব্যাপারকে একসঙ্গে জুড়ে একটা অর্থ করলে। যে অর্থটা খুবই মূল্যবান অর্থ। খবরটা বীরগঞ্জের রাজার কাছে দিতে পারলে মোটা বকশিষ পাওয়া যেতে পারে। গোপনে তারা বীরগঞ্জের রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

বীরগঞ্জ থেকে বিশেষ চর এল এই খবরের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু বীরগঞ্জের রাজার শক্তি খুব বেশী ছিল না। অন্যদিকে রাজাবাবু পুরোদমে লোক-লস্কর ও হাতিয়ার সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর হাতে কয়েকটা ডাকাতের দল ত ছিলই। এখন নৌকার সংখ্যা বাড়াবার জন্য প্রচুর নৌকা তৈরি হচ্ছে। বীরগঞ্জের রাজা দ্বিধা করতে লাগলেন যে, তাঁর যে শক্তি আছে তাই দিয়ে কোতলপুরের রাজাবাবুকে আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা।

রতীন বলতে লাগল:

স্বাধীন হওয়ার লোভ বীরগঞ্জের রাজারও মনে ছিল। কিন্তু স্বাধীন হওয়া তো মুখের কথা নয়। কেল্লা চাই, গোলা-বারুদ চাই, অস্ত্রশস্ত্র চাই, জলে যুদ্ধ করবার জন্য নৌ-বাহিনী চাই। সৈন্য-সামন্ত অনেক কিছুই চাই। আর তার জন্য বহু অর্থেরই প্রয়োজন। তত অর্থ কোথায় পাওয়া যায়?

তবে রাধাকে যদি পুত্রবধূরূপে পাওয়া যায়, তাহলে বীরগঞ্জের রাজার স্বপ্নও ফাঁকতালে সফল হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তিনি এক কাণ্ড করলেন। কিছু লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে একখানা জমকালো পাল্কী পাঠিয়ে দিলেন কোতলপুরে। আর তার সঙ্গে রাজাবাবুর কাছে একখানা চিঠি। তাতে তিনি এই লিখলেন যে, কয়েক মাস হল চরে যে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে সেই মেয়েটিকে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবেন। সেজন্য পাল্কী এবং লোকজন পাঠান হল। আশা করি আমার এই আদেশের অন্যথা হবে না।

চিঠি পড়ে রাজাবাবু অবাক। এই আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল যে, খবরটা বীরগঞ্জের রাজা, এমন কি নবাব বাহাদুরের কাছেও পৌছতে পারে। বুঝলেন, বীরগঞ্জের রাজা সহজে ছাড়বেন না, লড়াই অনিবার্য। বীরগঞ্জের রাজার সঙ্গে তো বটেই, হয়ত বা নবাবী ফৌজের সঙ্গেও। কারণ অধীনস্ত জমিদারকে সায়েস্তা করবার জন্য বীরগঞ্জের রাজা নবাবের সাহায্য চাইতে পারেন। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু চিঠিখানা বিনীতভাবেই লিখলেন: আপনার আদেশ কখনও অমান্য করিনি। এই আদেশও অমান্য করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু একটা মুস্কিলে পড়েছি। কন্যাটি আমার পুত্রের জন্য বাগদত্তা। বাগদত্তা কন্যাকে গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি থাকবে। আপনার আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

পাল্কী ফিরে গেল। রাজাবাবু জানতেন পাল্কী আবার ফিরে আসবে। এবং শেষ পর্যন্ত বীরগঞ্জের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তিনি যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

রতীন বলতে লাগল:

গোপন কিছুই রইল না। ওদিকে বীরগঞ্জের রাজাও তৈরি হতে লাগলেন।

বাধা হল তুরুপের তাস।

রাজাবাবু তার বাপমায়ের সন্ধানে অনেক সময় নষ্ট করলেন। আর নষ্ট করতে রাজি হলেন না। সামনের শুভদিনেই বিবাহের দিন ধার্য করলেন। এ খবরটাও বীরগঞ্জে গিয়ে পৌছল।

আগেই বলা হয়েছে তখন রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, ডাক ও তার বিভাগও ছিল না। সুতরাং খবরটা পৌছতে সময় নিল। অন্য দিকে বিয়েও

যে-সে দিনে দেওয়া যায় না। তারও দিনক্ষণ আছে। এবং সেটাও ফরমাস মত করা যায় না।

রাজাবাবুর তখন নিঃশ্বাস নেবার ফুরসৎ নেই। এদিকে বিয়ের আয়োজন, অন্যদিকে যুদ্ধের আয়োজন। হাতে সময় অল্প।

তিনি আরও একটা কাজ করলেন: বীরগঞ্জের রাজা নবাব বাহাদুরের সাহায্য চাইবার আগেই তিনিই নবাবের শরণাপন্ন হলেন। জানালেন বীরগঞ্জের রাজা তাঁর বাগদত্তা পুত্রবধূকে জোর করে কেড়ে নিতে চান।

নবাবটি খুব ভালো লোক ছিলেন। একজনের বাগদত্তা পুত্রবধূকে গায়ের জোরে অন্য লোক কেড়ে নেবে, এটা তিনি সমর্থন করবেন না এই বিশ্বাস রাজাবাবুর ছিল।

কিন্তু তার ঘোড়সোয়ার তখন হয়ত রাজধানীর উদ্দেশ্যে বড় জোর মাইল দশেক গেছে। এমন সময় খবর এল বীরগঞ্জের রাজা আসছেন লাঠি-সোটা লোক-লস্কর নিয়ে।

যুদ্ধ অনিবার্য।

কিন্তু এরি মধ্যে রাজাবাহাদুর একটা কাজ করে বসলেন। একটা মাঝারি গোছের বিবাহের দিন ছিল, সেইদিনে কুমারের সঙ্গে রাধার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

ধুমধাম বিশেষ করলেন না, শুধু লোক মারফৎ বীরগঞ্জের রাজার কাছে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালেন। ভরসা খবরটা পেয়ে বীরগঞ্জের রাজা যদি থেমে যায়। কেননা, অন্যের বিবাহিত পুত্রবধূকে কেউ নিজের পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে পারবে না।

কিন্তু বীরগঞ্জের লোক-লস্কর তখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। নিমন্ত্রণ-পত্র মাঝপথেই বীরগঞ্জের রাজার হস্তগত হল।

রাজা তো আগুন।

তিনি রাজাবাবুর ঘোড়সোয়ারকে হুকুম দিলেন, তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে এখনই কোতলপুরে ফিরে গিয়ে রাজাবাবুকে বিয়ে বন্ধ করতে বল। এ বিয়ে হলে আমি কোতলপুরের একখানা ইট আস্ত রাখব না। বলবে আমি নিজে আসছি লোকজন নিয়ে। আমার ছেলেও যাচ্ছে সঙ্গে। ওই লগ্নেই আমার ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হবে। রাজাবাবু হবেন কন্যাকর্তা। যাও।

যতীন বলতে লাগল :

রাজাবাবুর ঘোড়সোয়ার তখনই ছুটল কোতলপুরের দিকে। নিজের লোক-লস্করকেও বীরগঞ্জের রাজা হুকুম দিলেন তখনই কোতলপুরের দিকে রওনা হতে। হাতে সময় বেশী নেই।

রাজাবাবুও এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। মেয়েটিকে কখনই তিনি অন্যের হাতে দিবেন না এই তাঁর পণ। কোতলপুর থেকে মাইল দশেক দূরে যেখানে বীরগঞ্জের সৈন্যদের নদী পার হওয়ার কথা সেখানে উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে তিনি একদল সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন। ইচ্ছা বিবাহটা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়।

তাই হল।

ওপারে বীরগঞ্জের সেপাই, এপারে রাজাবাবুরা। মাঝখানে নদী। দুটো দিন পরস্পরের তাল ঠোকাঠুকিতেই কেটে গেল।

ইতিমধ্যে বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

রাজাবাবুর সাহস বেড়ে গেল। সাপে যে মেয়ের মাথায় ফণা ধরেছিল এতদিনে ধর্মতঃ সে কোতলপুরের রাজলক্ষ্মী হল।

রাজাবাবু নিশ্চেষ্ট বসে রইলেন না। কোতলপুরের ঘাটে নদী পার হয়ে নিজে যাত্রা করলেন একজন সিপাহী নিয়ে। বন-বাদাড় খানা-ডোবার আড়াল দিয়ে তাদের নিয়ে নিজে যাত্রা করলেন।

ওদিকে তখনও তাল ঠোকাঠুকি চলছিল। বীরগঞ্জের সিপাইরা শত্রুর সামনে নদী পার হতে সাহস করছিল না।

এমন সময় অতর্কিতে রে রে করে রাজাবাবু গিয়ে পড়ল বীরগঞ্জের সিপাইদের ওপর। অতর্কিত আক্রমণে অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা যে যেদিকে পারল পালাল।

বীরগঞ্জের রাজা ও রাজপুত্র দু'জনেই বন্দী হলেন।

এটা রাত্রের ঘটনা।

পরদিন ভোরেই নবাবের হুকুমনামা নিয়ে নবাবী ঘোড়সোয়ার এসে পৌঁছুল।

নবাব বীরগঞ্জের রাজাকে অবিলম্বে রাজধানী যাবার জন্য তলব করেছেন।

অগত্যা বীরগঞ্জের রাজাকে ছেড়ে দিতে হল। তিনি গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নবাবের সামনে দাঁড়ালেন।

নবাবের ঘোড়সোয়ার বীরগঞ্জের রাজার যুদ্ধযাত্রা এবং পরাজয়ের কাহিনী নবাব বাহাদুরকে নিবেদন করল।

শুনে নবাব বললেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল। তোমার উচিত সাজা হয়েছে। তোমার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হল, এবং তা রাজাবাবুকে দেওয়া হল।

বীরগঞ্জের রাজা অনেক কান্নাকাটি করল। কিন্তু নবাব বাহাদুর শুনলেন না। বললেন, যে অন্যের বাগদত্তা পত্রবধূকে ছিনিয়ে নিতে চায়, সে রাজা হবার যোগ্য নয়। তার হাতে রাজ্য থাকা নিরাপদ নয়।

রাজাবাবুর স্বপ্ন সফল হল, এতদিনে তিনি রাজা হলেন। কিন্তু রাজধানী কোতলপুরেই রইল।

এইখানে গল্পটি শেষ করে রতীন ও যতীন বাড়ী ফিরল।



শতফুটি সহস্রফুটি দাদাঠাকুর

এক যে ছিল গ্রাম। নিতান্তই চাষার গ্রাম। কেবল একঘর বামুন। তা সে বামুনের অবস্থা তথৈবচ। কোনো রকমে প্রথম ভাগ শেষ করে শত জায়গায় তিলকফোঁটা কেটে শতফুটি দাদাঠাকুর হয়ে বসেছে। গ্রামের চাষাদের ধারণা—এত বড় পণ্ডিত ও-তল্লাটে আর নেই। তাদের ক্ষেতে যা কিছু হয়, আগে দাদাঠাকুর না দিয়ে ঘরে তোলে না। এমনি করে দাদাঠাকুরের দিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলে যায়।

অনেকদিন পরে গ্রামের চাষীরা একদিন সকালে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে গল্প করছিল। এমন সময় দেখলে, বহুলোক ভারে ভারে নানা জিনিস নিয়ে যাচ্ছে—ঘড়া, ঘটি, তৈজসপত্র এবং আরও কত কি!

চাষীরা জিজ্ঞেস করলে, কে যায়?

দলের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিলেন, মধ্যমগ্রামের সার্বভৌম মহাশয়। চাষীরা সসব্যস্তে দাওয়া থেকে নেমে এসে সার্বভৌম মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলেন মশাই?

সার্বভৌম তাদের আশীর্বাদ করে হেসে বললেন, রাজবাড়ীতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে গিয়েছিলাম।

—তা এইসব জিনিসপত্র?

সার্বভৌম সবিনয়ে বললেন, তাঁকে তর্কে পরাস্ত করে এইসব পেলাম।

—তাই নাকি? তাহলে তো আজ এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে হবে?

সার্বভৌম মশায় বিস্মিতভাবে বললেন—কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, আমাদের এখানেও এক ভীষণ পণ্ডিত আছেন, তাঁর সঙ্গে তক্ক করে যেতে হবে।

এখানে যে একজন বড় পণ্ডিত আছেন, সে খবর সার্বভৌম মশায় এর আগে কখনও শোনেন নি। বললেন, তা তো জানতাম না বাবা। কি তাঁর নাম?

—শতফুটি দা'ঠাকুর।

এ নাম তিনি জীবনে শোনেন নি। ভাবলেন, তা হবে। হয়তো সম্প্রতি কোন বড় পণ্ডিত এখানে এসে বাস করছেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন, বেশ, তাই হবে।

চাষীরা বললেন, ও হবে নয় ঠাকুরমশাই। আপনি যদি জেতেন, তাহলে দা'ঠাকুরের যা আছে, সব পাবেন। আর যদি হারেন, তা হলে যা নিয়ে যাচ্ছেন সব রেখে যেতে হবে।

সার্বভৌম মশায় তাতেও আপত্তি করলেন না। তাঁর আর ভয় কি? অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যিনি হারিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলে তাঁকে হারাবে কে?

ভারীরা সেইখানেই জিনিসপত্র সব নামাল। সে সব দেখে চাষাদের তাক লেগে গেল! কত সোনা-রূপোর বাসন, কত পাটের কাপড়, কত টাকা-মোহর। জীবনে তারা এসব দেখেনি। পরম সমাদরে তারা সার্বভৌম মশায়ের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে থাকবার জায়গা করে শতফুটি দাদাঠাকুরকে গেল খবর দিতে। দাদাঠাকুর সমস্ত শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার হাসলে। জিজ্ঞেস করলে, আমার মতো লম্বা-চওড়া?

চাষীরা বললে, কোথায় পাবেন? আপনার আধখানা। যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা। আর কথা কয়, যেন ছ'মাস খায়নি। দেখে আমাদের ভক্তি হল না মশায়। শ্রীচৈতন্যটিও আপনার আধখানা।

দাদাঠাকুর আশ্বস্ত হয়ে আর একবার হাসলে। বললে, বেশ। পাঁচখানা গাঁয়ে ঢোল দে। আমি বিকেলে যাব।

বিকেল হতে না হতে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানটা একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। তিল ধরবার আর জায়গা রইল না। এ সময়টা চাষের কাজ নেই। কাজেই পাঁচখানা গ্রামের যত চাষী সবাই এসে জুটল।

সার্বভৌম মশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানা আসনের উপর চোখ বন্ধ করে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে। তাঁর সামনের আসনখানি খালি রয়েছে, শতফুটি দাদাঠাকুর তখনো আসেনি।

একটু পরে হেলতে-দুলতে সে এলো। মিশকালো, লম্বা-চওড়া চেহারা। তার উপর শত স্থানে তিলক চিহ্ন যেন জলজ্বল করছে। উঠানের জনতা সসম্ভ্রমে তাকে পথ ছেড়ে দিল।

প্রথামত সার্বভৌম মহাশয়ও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালেন। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। কিন্তু দাদাঠাকুর নমস্কারও ফিরিয়ে দিলে না, একটা কথাও কইলে না। আসনে বসেই বজ্রকণ্ঠে বললে—বলুন তো 'ফুন ফুনাফুন?'

ফুন ফুনাফুন? সার্বভৌম মশায় যেন বিশ বাঁও জলে পড়লেন। আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন, কিন্তু 'ফুন ফুনাফুন' বলে কোনো শব্দ কোথাও পড়েছেন বলে মনে পড়ল না। এ জীবনে যত পুঁথি তিনি পড়েছেন সব তন্ন তন্ন করে ভাববার চেষ্টা করলেন না। ও শব্দটি একেবারে নতুন।

শতফুটি দাদাঠাকুর আবার ধমকে দিলে, বলুন।

সার্বভৌম মশায় ঘামতে লাগলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। লজ্জায়, ধিক্কারে তাঁর চোখ ফেটে জল আসবার মতো হল। অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে এসে শেষে এইখানে হারতে হল। সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ভরাডুবি? কি আশ্চর্য। এত শাস্ত্র পড়েছেন কিন্তু এমন অদ্ভুত শব্দ তো কোথাও পাননি। 'ফুন ফুনাফুন'?

কিন্তু শতফুটি আর ভাবতে সময় দিলে না। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কিছুই না পড়ে আমার সঙ্গে এসেছ তর্ক করতে? চালাকির আর জায়গা পাওনি? এই, কে আছিস?

চাষীরা হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়ালো। দা'ঠাকুর জিতেছে, তাদের আর পায় কে?

শতফুটি হুকুম দিলে, এর যা কিছু আছে, সব নিয়ে আমার বাড়ী তোল। আর একে গাঁ থেকে বার করে দে।

তাই হল। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চললেন। কান্নার আর দোষ কি? তাঁর ধন গেল, সম্পদ গেল, এমন কি সম্মান পর্যন্ত গেল। এর পরে গ্রামে গিয়ে মুখ দেখাবেন কি করে? সার্বভৌম মশায় কাঁদতে কাঁদতে চললেন। তাঁদের গ্রামের ধারে তাঁর ছোট ভাই তখন একটা গাছের থেকে পাতা ভেঙ্গে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর গরুগুলো নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই খাচ্ছিল।

সার্বভৌমের এই ভাইটি লেখাপড়ার ধারে দিয়ে যায় না। বাড়ীর চাষ-বাস ক্ষেত-খামার দেখে। দাদার উপর তার অচলা ভক্তি। গাছের উপর থেকে দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি নেমে এল। ছুটে গিয়ে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, দাদা, তুমি কাঁদছ কেন?

সার্বভৌম সেইখানে বসে পড়ে বললেন, ভাইরে, আমি চললাম। এ মুখ আর দেশে দেখাব না।

—কেন? কি হল? দিগ্বিজয়ীর কাছে হেরে এলে? তা অমন হার জিত কত হয়।

—না রে ভাই, হেরেছি বটে, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর কাছে নয়। তাঁকে হারিয়ে ভারে ভারে জিনিসপত্র নিয়ে আসছি, পথে এক শতফুটির পাল্লায় পড়ে……

সার্বভৌম সব কথা ভাইকে খুলে বললেন।

ভাই তো হেসেই অস্থির, বললে, কি জিজ্ঞেস করলে? ফুন ফুনাফুন?

—হ্যাঁ।

ভায়ের হাসি আর থামে না। বললে, ওসব তোমার শাস্তরে নেই দাদা। আমার শাস্তরের কথা তুমি জানবে কি করে? দাও, তোমার চাদরখানা।

সার্বভৌম তাড়াতাড়ি ভায়ের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, পাগল! আমি তাঁর সঙ্গে পারলাম না, আর তুই গণ্ডমূর্খ তুই যাবি।

কিন্তু ভাই কিছুতেই শুনলে না। বললে, দাও না চাদরখানা। বাড়ী গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেবে। সে এসে গরুগুলো নিয়ে যাবে। দেখই না আমি কি করে আসি।

সার্বভৌম ভাইকে আটকে রাখতে পারলেন না। তাঁর কাছ থেকে চাদরখানা এক রকম কেড়ে নিয়েই সে চলে গেল। দাদার অপমানে সে

বেজায় চটে গেছে। পথে কোথাও থামল না, থামল একেবারে ময়না নদীর ধারে গিয়ে। এই নদীটির ধারেই শতফুটির গ্রাম।

নদীর জলে সে বেশ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললে। তারপরে সারাদেহে নানা জায়গায় তিলক কেটে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। তখন চণ্ডীমণ্ডপে সার্বভৌম মশায়ের লাঞ্ছনা নিয়ে চাষাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি চলছিল। তিলককাটা ব্রাহ্মণকে দেখে তারা বললে, কে যায়?

সে বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলে, আমি সহস্রফুটি দাদাঠাকুর।

ওরে বাবা! ওদের দাদাঠাকুর শতফুটি, এ আবার সহস্রফুটি! সবাই একটু দমে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বললে, কি চান?

সহস্রফুটি জোর গলায় বললে, তোমাদের এখানে শুনেছি একজন বড় পণ্ডিত আছে। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতে চাই।

শুনেই চাষারা হো হো করে হেসে উঠল। বললে, সে বড় সহজ পণ্ডিত নয় ঠাকুর। তুমি পালাও। এখনই এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত তার কাছে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেল।

সহস্রফুটি সগর্বে বললে, ডাক তোমাদের দাদাঠাকুরকে। তাকে না হারিয়ে আমি ফিরছি না।

অগত্যা চাষারা গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। শতফুটি দুলতে দুলতে এল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বল দেখি ফুন ফুনাফুন?

সহস্রফুটি প্রশ্ন শোনামাত্রই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শতফুটির গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বেল্লিক! ফুন ফুনাফুন? আগে টুক টাকটুক, তারপর গুন গুনাগুন, তারপর ফুন ফুনাফুন।

প্রচণ্ড চড় খেয়ে শতফুটি তখন চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে বসে পড়েছে। তার কথা বলবার শক্তি নেই। সহস্রফুটি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিতেই যন্ত্রণায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। কারণ সহস্রফুটির গায়ে ভীষণ জোর, তার চেয়ে অনেক বেশী। না কেঁদে উপায় কি?

চাষারা সার্বভৌমের বেলায়ও কিছু বোঝেনি। এখনও তর্কের কিছু বুঝল না। কিন্তু তাদের দাদাঠাকুরকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে অঝোরে কাঁদতে দেখে তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এবারে শতফুটি হেরেছে।

সহস্রফুটি ঘুরে-ফিরে সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

—এসব তুলো-ধোনা শাস্তরের কথা। আগে তুলোগুলো টুকটুক করে বেছে নিতে হয়। তারপর জোরে জোরে গুন্‌গুন করে ধুনতে হয়। ধোনা হয়ে গেলে ফুনফুন করে হাল্‌কা ঘা দিতে হয়। বেল্লিকটা সেই কথা আমাকে বোঝাতে এসেছে। ওরে বাবা! আমার কি আর শাস্তর পড়তে বাকি আছে?

শুনে চাষারা জয়ধ্বনি করে উঠল, জয় সহস্রফুটি দাদাঠাকুরের জয়! সবাই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শতফুটিকে ঢাক বাজিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিলে। সার্বভৌমের কাছ থেকে যত জিনিস সে পেয়েছিল, সব তারা সহস্রফুটিকে দিয়ে দিলে। সহস্রফুটি কয়েকদিন সেখানে থেকে তারপর খুব ধুমধাম করে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী গেল।

দাদাকে গিয়ে সব কথা বলতেই তিনি আত্মহারা হয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল ভাই। পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের তর্ক হয়। মূর্খের সঙ্গে তর্কে পণ্ডিতরা পারবে কেন। ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল। তা বেশ হয়েছে। ওরা যখন ধরেছে, তখন তুই ওদের গাঁয়েই দাদাঠাকুর হয়ে বসবাস কর বরং। কিন্তু দেখিস, যেন আমার মত নিরীহ কোন পণ্ডিত পেয়ে তাকে ঠকাসনে।

তারপর সহস্রফুটি দাদাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে ওদের গ্রামে বাস করতে চলে গেল।